আর্কাদি গাইদার

তিমুর ও তার দলবল

 'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো

আর্কাদি গাইদার

তিমুর ও তার দলবল

'রাদুগা' প্রকাশন

মস্কো

সম্পাদনা: ননী ভৌমিক

অঙ্গসজ্জা: ভ. আলেক্সেয়েভ ও ন. গ্রিশিন

Г $\frac{70803\text{-}179}{031(01)\text{-}83}$ 569-82 4803010102

সাঁজোয়া ইউনিটের অধিনায়ক কর্নেল আলেক্সান্দ্রভ মাস তিনেক আগে বাড়ি ছাড়েন। তার মানে নিশ্চয় গেছেন যুদ্ধে।

গ্রীষ্মের মাঝামাঝি তিনি বাড়িতে তাঁর দুই মেয়ে ওলগা আর জেনিয়াকে টেলিগ্রাম করে জানান, তারা যেন বাকি ছুটিটা মস্কোর বাইরে তাদের বাগান-বাড়িতে গিয়ে কাটিয়ে আসে।

জেনিয়া তার রঙীন রুমালটা মাথার আরও পেছনে সরিয়ে ঝাড়ুর ওপর ভর দিয়ে ভুরু কুঁচকে ওলগার কথা শুনছিল।

ওলগা বলছিল, 'আমি লটবহর নিয়ে চললাম। তুই ঘরদোর পরিষ্কার কর। ভুরু কুঁচকে ঠোঁট কামড়ে কোন ফল হবে না। দরজায় তালা দিতে ভুলবি না। লাইব্রেরির বইগুলো ফেরৎ দিয়ে আসবি। বান্ধবীদের কাছে আড্ডা মারতে না গিয়ে সোজা স্টেশনে চলে যাবি। স্টেশনে পেঁছে এই টেলিগ্রাম পাঠাবি বাবাকে। তারপর গ্রামের গাড়ি ধরবি... জেনিয়া! আমার কথা শুনতে হয়... আমি তোর বোন হই না...'

'আমিও তো বোন।'

'আমি হলাম তোর বড়... তাছাড়া বাবা এই কথাই বলেছেন।'

ট্রাকটা গজরাতে গজরাতে চত্বরের বাইরে থেকে বেরিয়ে গেল। জেনিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। সব আগোছাল। সে সরে এল দেয়ালের ধুলো-মাখা আয়নার কাছে। উল্টোদিকে রাখা বাবার ছবিটার ছায়া পড়েছে আয়নাটায়।

বেশ! ওলগা না হয় বড়ই হল। তার কথা না হয় শুনতে হয়, কিন্তু সে

জেনিয়া — তারও তো বাবার মতো নাক, মুখ আর ভুরু। আর খুব সম্ভবত বাবার স্বভাবও সেই পেয়েছে।

রুমালের গিঁটটা জোরে বেঁধে পায়ের স্যাণ্ডেল ছুঁড়ে ফেলে সে ঘরমোছার ন্যাকড়া তুলে নিল। তারপর এক ঝটকায় টেবিলের চাদর তুলে কলের নীচে বালতি বসিয়ে ঝাঁটা দিয়ে স্তূপাকার জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে নিয়ে এল দরজার কাছে।

একটু পরেই তেলের স্টোভ হিসহিস করে উঠল — শুরু হল প্রাইমাসের গুঞ্জন।

মেঝে ভেসে গেল জলে।

কাপড় কাচার গামলায় জমল ফেনাওঠা সাবানের জল। বাইরের পথচারীরা অবাক হয়ে দেখছিল খালিপায়ে লাল ফ্রক-পরা একটি কচি মেয়ে কেমন নির্ভয়ে তিন তলার জানালার ঝন্‌কাঠে দাঁড়িয়ে হাট করে খোলা জানালার শার্সি মুছছে।

রোদ্দুরে ভরা প্রশস্ত রাস্তায় ট্রাকটা ছুটছে। ওলগা ওপরে একটা বেতের চেয়ারে বসে আছে। পা রেখেছে স্যুটকেসে আর ঠেস দিয়ে আছে একটা নরম পুঁটলির ওপর। তার কোলে একটা লালচে-বাদামী বেড়ালছানা একগোছা ঘাসের ফুল নিয়ে খেলা করছিল।

ত্রিশ কিলোমিটারের কাছাকাছি লাল ফৌজের একটি মোটরবাহিনী তাদের ধরে ফেলল। সৈনিকেরা কাঠের বেঞ্চে সারি দিয়ে বসেছিল; রাইফেলের মুখগুলো আকাশের দিকে তোলা, সবাই গান ধরেছিল একসুরে।

গানের আওয়াজে কুটিরগুলোর দরজা জানালা ঝনাৎ করে খুলে যেতে লাগল। গেট পেরিয়ে বেড়া টপকে হাসিখুসি বাচ্চাকাচ্চার দল এল ছুটে। সকলে আনন্দে হাত নাড়তে নাড়তে আধপাকা আপেল ছুঁড়তে লাগল সৈনিকদের দিকে, চ্যাঁচাল — হুররে! তারপরই আরম্ভ হল সেপাই-সেপাই খেলা। তাদের ঘোড়সওয়ারী ঝটিতি হামলার লক্ষ্য হল আশেপাশের যত ঘাস আর বিছুটিবন।

বাগান-বাড়ি এলাকাটার বাঁক ঘুরে ট্রাকটা এসে থামল লতায় ঘেরা ছোট্ট একটি কুটিরের সম্মুখে।

ড্রাইভার ও তার সহকারীরা ট্রাক খুলে মাল খালাস করতে আরম্ভ করল। আর ওলগা খুলল তাদের শার্সি-বসানো বারান্দার দরজাটা।

এখান থেকে চোখে পড়ে পোড়ো একটা বড় বাগান। বাগানের ভেতর দিকে এক বিদঘুটে দোতলা গোলাবাড়ি। তার মাথায় উড়ছে ছোট্ট লাল নিশান।

ওলগা ট্রাকের কাছে ফিরে এলে তার কাছে খুট খুট করে হাজির হল চটপটে এক বুড়ি গয়লানী। পাশের বাড়িতেই সে থাকে। সে এসে কুটিরটার মেঝে, দেয়াল আর জানালাগুলো ধুয়ে মুছে দিতে চাইল।

পড়শীটি যখন ন্যাকড়া আর বালতি নিয়ে লেগেছে, ওলগা তখন তার বেড়ালছানা নিয়ে গেল বাগানে।

চড়ুই-ঠোকরানো চেরিগাছগুলোর গায়ে রজনের গরম ফোঁটাগুলো ঝিক্‌মিক্‌ করছে। ক্যারেণ্ট, ডেজিফুল আর ওয়ার্মউডের কড়া গন্ধে বাতাস ভরপুর। গোলাবাড়ির শ্যাওলা-ধরা ছাদে অজস্র ফুটো। তা থেকে সরু সরু কতকগুলো দড়ি এসে উঠেছে পাশের গাছপালায়।

মুখের ওপর থেকে মাকড়সার জাল সরাতে সরাতে হেজেলের ঝোপঝাড় ভেঙে এগোচ্ছিল ওলগা।

কি হল? গোলাবাড়ির ছাদ থেকে লাল নিশানটা যে উধাও। কেবল দাঁড়িয়ে আছে ডাণ্ডাটা।

এবার একটা দ্রুত শংকিত ফিসফাস ওলগার কানে এল। আচমকা গোলাবাড়ির টঙের জানালায় হেলান দেওয়া ভারি মইটা পড়ল উল্টে। দড়াম করে মাটিতে পড়বার সময় গুচ্ছের শুকনো ডালপালা ভাঙল মটমট করে আর ভাটুইগাছগুলো গেল থেঁৎলে।

চালার ওপরকার দড়িগুলো কাঁপতে লাগল। বেড়ালছানাটা ভয়ে ওলগার হাতটা আঁচড়ে বিছুটিবনে ডিগবাজি খেয়ে পড়ল। হতভম্ব ওলগা থমকে চারিদিকে তাকাল, তারপর কান খাড়া করে শুনতে লাগল। কিন্তু কি গাছপালার ঝোপে, কি অন্যদের বেড়ার ওপাশে কিংবা গোলাবাড়ির অন্ধকার চৌকো জানালায় পেছনে কোথাও কিছু তার নজরে পড়ল না বা কানে এল না।

অলিন্দের কাছে ফিরে এল সে।

গয়লানী ওলগাকে বুঝিয়ে বললে, 'যতসব ছোঁড়ার দল পরের বাগানে এসে নষ্টামি করছে। কাল আমাদের পড়শীর এক বাগানের দুটো আপেলগাছের সব আপেল ঝাঁকিয়ে ফেলে দিয়েছে। একটা নাশপাতিগাছের ডালপালাও ভেঙে দিয়েছে সেইসঙ্গে। কী যে সব হয়ে উঠছে, একবারে গুণ্ডা... এই তো সেদিন দিদিমণি, আমার ছেলেটি গেল লাল ফৌজে। গেল কেমন, কোনো পানভোজন কিছু না। 'চললাম, মা!' বলেই শিস দিতে দিতে চলে গেল, যাদু আমার! তা সন্ধ্যের দিকে যেমন হয় মনটা খারাপ লাগল, তাই কাঁদলাম খানিকটা। রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেল. শুনি কারা যেন উঠোনে পা টিপে টিপে হাঁটছে। ভাবছি এবার তো আমি একলা মেয়েমানুষ, সহায় নেই কেউ। বুঝতেই তো পারছ, আমার মতো বুড়িকে কাবার

করতে বেগ পেতে হবে না কাউকে। মাথায় শুধু একটা ইঁটের বাড়ি, তাহলেই হল। তবে ভগবানের দয়া, কিছুই চুরি যায় নি। এদিক সেদিক পা টিপে টিপে একটু হাতড়ে টাতড়েই কেটে পড়েছে। শুধু উঠোনে আমার একটা পিপে দাঁড় করানো ছিল, ওক কাঠে তৈরি সেটা, জন দুই লোক মিলেও তাকে নড়ায় কার সাধ্যি। সেটাকে ফটকের দিকে প্রায় হাত চল্লিশেক সরিয়ে রেখে গেছে তারা। ব্যস্, আর কিছুই নয়। কী যে সব লোক হয়েছে, কী সব মানুষ! ব্যাপার ভালো নয়।'

সন্ধ্যেবেলায় ঘরদোর পরিষ্কারের কাজ শেষ হলে ওলগা অলিন্দে বেরিয়ে এসে খুব সন্তর্পণে চামড়ার বাক্স খুলে ঝকমকে ঝিনুকের কাজ-করা সাদা এ্যাকর্ডিয়নটা বার করল। বাবা জন্মদিনে তাকে এটা উপহার দিয়েছিলেন।

এ্যাকর্ডিয়নটা সে হাঁটুর ওপর রেখে তার ফিতেটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। তারপর তাতে একটা গানের সুর সাধতে লাগল। গানটি সে সম্প্রতি শুনেছিল:

হায়, যদিবা দেখা পেতাম আরবার
চোখে চোখে চাইতে পেতাম আরবার

হায়, যদিবা দেখা পেতাম আরবার...
দেখা পেতাম দুইবার, বা তিনবার...
কিন্তু তুমি গেলে যখন চলে,
জানলে না তো রইল যে সে কোন বেদনায় জ্বলে,
দিনের পরে রাত কেটে যায় কোন সে আশার ছলে।
হায়!
বিমানচালক, বৈমানিক!
শূন্যগামী হে সৈনিক!
আকাশে পাখা বিস্তারি
সাগর ভূধর দাও পাড়ি।
আবার ফিরে আসবে কবে?
হয় যদিবা হোক না দেরি,
তবু তোমায় আসতে হবে, হোক না দেখা নিমেষেরই।

গানের মাঝে মাঝে ওলগা সতর্ক দৃষ্টিতে বেড়ার কাছে এক অন্ধকার ঝোপের দিকে তাকাচ্ছিল।

তারপর গান শেষ করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে ঝোপের দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে উঠল, ‘শুনছেন! লুকোচ্ছেন কেন? কি চাই আপনার?’

সাধারণ সাদা পোশাকে একজন লোক ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। মাথা নুইয়ে ভদ্রভাবে উত্তর দিল, ‘লুকোই নি। আমি নিজেও একটু আধটু অভিনয় করি। বাজনার মধ্যে আপনাকে বাধা দিতে চাই নি বলে আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম।’

‘তা রাস্তায় দাঁড়িয়েও শুনতে পারতেন। বেড়া ডিঙোতে গেলেন কেন?’

‘আমি?.. বেড়া ডিঙোব?..’ স্পষ্টই বোঝা গেল লোকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ‘মাপ করবেন, আমি বেড়াল নই। ওদিকের কোণায় বেড়াটা ভাঙা। তার ভেতর দিয়ে গলে এসেছি।’

একটু বাঁকা হেসে ওলগা বলল, ‘বুঝলাম! এখন, ঐ যে গেট দেখছেন — এবার ভালোমানুষটির মতো ওর মধ্যে দিয়ে গলে বেরিয়ে পড়ুন তো!’

দেখা গেল লোকটি নিতান্ত বাধ্য। কোন কথা না বলে গেট দিয়েই সে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় পিছনে গেটটা বন্ধ করেও দিল। এতে ওলগা খুসি হল একটু।

অলিন্দ থেকে নামতে নামতে সে ডাকল, ‘এক মিনিট! বলছিলেন না আপনি অভিনেতা?’

লোকটি উত্তর দিল, ‘না। আমি একজন মেকানিক-ইঞ্জিনিয়ার। অবসর সময়ে আমাদের কারখানার অপেরায় পার্ট করি।’

কিছু না ভেবেই ওলগা হঠাৎ বলে বসল, ‘দেখুন, আমাকে স্টেশনে পেঁাছে দিতে পারবেন? আমার ছোট বোনের আসবার কথা আছে। এমনিতেই বেশ দেরি হয়ে গেছে। অন্ধকারও হয়ে এল, অথচ তার আসার কোন লক্ষণ দেখছি না। ভয় আমার করছে না বটে; তবে কিনা এদিকের পথঘাট তো আমার চেনা নেই। আপনি আবার গেটটা খুলছেন কেন? বেড়ার পাশেই তো অপেক্ষা করতে পারেন আমার জন্যে।’

এ্যাকর্ডিয়নটা তুলে রেখে শাল কাঁধে জড়িয়ে সেই অন্ধকার রাস্তায় নেমে এল ওলগা। পথ ভুর ভুর করছে শিশিরে আর ফুলের গন্ধে।

জেনিয়ার ওপর রেগেছিল বলে ওলগা সঙ্গীটির সঙ্গে কথা বলছিল কদাচিৎ। লোকটি নাম বলল গেওর্গি গারায়েভ — কোন এক মোটর কারখানার মেকানিক-ইঞ্জিনিয়ার।

দুটো ট্রেন চলে গেল। তবু জেনিয়ার দেখা নেই। তৃতীয়টিই ছিল শেষ গাড়ি। সেটাও এসে চলে গেল।

ওলগা চেঁচিয়ে উঠল, ‘কি দুশ্চিন্তায় যে ফেলে পাজি মেয়েটা আমাকে! বয়স আমার বছর চল্লিশেক হলেও বা হত, নয়ত নিদেন পক্ষে তিরিশ, তাহলে অন্য কথা ছিল। কিন্তু সে তেরো আর আমি আঠারো। কিছুতেই তাই ও আমার কথা শোনে না।’

‘চল্লিশের দরকার নেই!’ জোর দিয়ে বলল গেওর্গি। ‘আঠারোই বেশ ভাল! ভাবনার কিছু নেই। আপনার বোন কাল ভোরেই এসে পড়বে।’

প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা হয়ে গেল। গেওর্গি সিগারেট-কেস বার করল। অমনি দুজন বেপরোয়া গোছের কিশোর সিগারেট হাতে নিয়ে তার কাছে এসে আগুনের জন্য দাঁড়িয়ে রইল।

দেশলাই জ্বেলে তাদের মধ্যে বড়টির মুখ আলো করে গেওর্গি বলল, ‘খোকা! সিগারেটটি বাড়িয়ে ধরার আগে শুভসন্ধ্যা জানাতে হয়। ইতিমধ্যেই তো পার্কে তোমাদের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছে। কি খাটুনিই না খাটছিলে তোমরা নতুন বেড়ার ওপর থেকে একটা তক্তা সরাবার জন্যে। মিখাইল ক্ভাকিন না তোমার নাম?’

ছেলেটা গাঁইগুই করে কেটে পড়ল। গেওর্গি দেশলাই নিবিয়ে ওলগাকে বাড়ি পেঁাছে দেবার জন্য তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

তারা চোখের আড়াল হতেই দ্বিতীয় ছেলেটি নোংরা সিগারেটের শেষটুকু কানে গুঁজে তাচ্ছিল্যভরে বললে, 'এই প্রচারকটি আবার জুটল কোত্থেকে রে? এখানকার লোক নাকি?'

অনিচ্ছায় ক্ভাকিন জবাব দিল, 'এখানকারই লোক, ও হল তিমুর গারায়েভের কাকা। আমাদের উচিত একদিন তিমুরকে ধরে আচ্ছা করে প্যাঁদানি দেওয়া। ও একটা নাকি দলও গড়েছে। মনে হচ্ছে আমাদের পেছনে লাগবে ওরা।'

ঠিক তক্ষুনি ছেলেদের নজর গেল এক পক্ককেশ সম্ভ্রান্তদর্শন বৃদ্ধের দিকে। প্ল্যাটফর্মের শেষের ল্যাম্পপোস্টের নিচে। লাঠিতে ভর দিয়ে তিনি সিঁড়ি বেয়ে নামছিলেন।

ইনি এখানকারই বাসিন্দা, ডাঃ ফ. গ. কলোকলচিকভ। এরা তাঁর পেছনে ধাওয়া করে চিৎকার করে শুধাতে লাগল তাঁর কাছে দেশলাই আছে কি না। এদের হাবভাব গলার স্বর যেন ভদ্রলোকের পছন্দ হয় নি মনে হল, কারণ তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে গিঁট-গিঁট পাকা লাঠি উঁচিয়ে শাসালেন তাদের। তারপর আবার এগিয়ে চললেন ধীর স্থির গম্ভীর চালে।

মস্কোর স্টেশন থেকে বাবাকে টেলিগ্রাম পাঠাবার সময় পায় নি জেনিয়া। তাই সে শহরতলির ট্রেন থেকে নেমেই ঠিক করেছিল স্থানীয় পোস্টাফিসের খোঁজ করবে।

ঘণ্টীফুল তুলতে তুলতে সে আনমনে এক পুরোনো পার্কের ভেতর দিয়ে চলছিল। চলতে চলতে তার খেয়ালই হয় নি কখন দুধারে বাগানে ঘেরা এক পথের বাঁকে এসে পড়েছে। জায়গাটার জনমানবহীন চেহারা দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেল যেখানে যাবার কথা সেখানে পেঁৗছয় নি।

দেখতে পেল অদূরে চটপটে একটা ছোট্ট মেয়ে একটা বেয়াড়া ছাগলকে গাল পাড়তে পাড়তে শিং ধরে টানছে।

জেনিয়া তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'খুকি, পোস্টাফিসের পথ কোন দিকে বলতে পার?'

ঠিক তক্ষুনি ছাগলটা তার হাত ছাড়িয়ে লাফাতে লাফাতে পার্কের ভেতর দিয়ে পিট্টান দিল। মেয়েটিও কাঁদতে কাঁদতে জোরে ছুটল তাকে ধরতে। জেনিয়া চারিদিকে তাকিয়ে দেখল: সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে আসছে, একটি জনমানবও চোখে পড়ে না। সামনেই যে গেটটা পড়ল তাই খুলে জেনিয়া এক হাঁটা-পথ ধরে ধূসর দোতলা বাগান-বাড়ির অলিন্দে গিয়ে উঠল।

দরজা না খুলে সে বেশ জোরে, তবে ভদ্রভাবেই শুধাল, 'পোস্টাফিসটা কোনদিকে পড়বে বলতে পারেন?'

কোনও উত্তর এল না। সেখানে দাঁড়িয়েই কি ভাবল একটু, তারপরে দরজা খুলে বারান্দার ভিতর দিয়ে একটি ঘরে এসে ঢুকল জেনিয়া। ঘরে কেউ নেই মনে হল। কেমন বিব্রত বোধ করে সে বেরিয়ে আসবার জন্য ফিরল। কিন্তু টেবিলের তলা থেকে একটা মস্তো হালকা বাদামী কুকুর নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। কুকুরটা সেই ভ্যাবাচ্যাকা-খাওয়া মেয়েটিকে ভাল করে লক্ষ্য করল কিছুক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরে গরগর করতে করতে চৌকাঠ আগলে শুল।

ভয়ে হাত নেড়ে জেনিয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'দূর বোকা! আমি চোর ছ্যাঁচর নই! কিচ্ছু চুরিও করি নি। এই দেখ, এইটে আমাদের ঘরের চাবি আর এটা বাবার জন্যে টেলিগ্রাম। আমার বাবা হলেন একজন সেনাপতি, বুঝলি?'

কুকুরটা জবাবও দিল না, নড়লও না। জেনিয়া খোলা জানালার দিকে চুপিচুপি এগোতে এগোতে আবার শুরু করল, 'দেখছিস তো! শুয়ে পড়লি? তা শুয়েই থাক না... ভারি সুন্দর কুকুর তুই... কেমন চালাক চতুর, কেমন মিষ্টি।'

কিন্তু যেই না জেনিয়া জানালার ঝন্‌কাঠে হাত দিয়েছে অমনি সেই মিষ্টি কুকুর তড়াক করে এমন খেঁকিয়ে উঠল যে জেনিয়া ভয়ে এক লাফে সোফায় উঠে পা গুটিয়ে নিল।

কাঁদো কাঁদো হয়ে সে বলতে লাগল, 'কী বিদঘুটে ব্যাপার! চোরডাকাত আর গোয়েন্দাদের ধর না কেন, আমি হলাম — আমি হলাম গিয়ে, আমি যে মানুষ, রে!' তারপর কুকুরটার দিকে জিভ ভেঙচিয়ে বলল, 'গাধা কোথাকার!'

জেনিয়া চাবি আর টেলিগ্রামটা টেবিলের কোণায় রাখল। বাড়ির লোকজন ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না তার।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল, তারপর আরেক ঘণ্টা... বেশ অন্ধকার হয়ে এল। খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসছে দূরের ট্রেনের বাঁশির আওয়াজ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর ভলিবলের ধপ্‌ধপানি শব্দ। কোথায় যেন কে গিটার নিয়ে টুংটাং করছে। শুধু এই ধূসর কুটিরটির আশেপাশে সব যেন কেমন নির্জন নিথর।

সোফার কঠিন হাতলে মাথা রেখে জেনিয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তারপর কখন পড়ল ঘুমিয়ে।

যখন ঘুম ভাঙল তখন ফর্সা হয়ে গেছে।

জানালার বাইরে বৃষ্টিতে ধোয়া ঘন গাছপালা বাতাসে মর্মর তুলছে। কুয়োতে পুলির ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে কাছেই। কোথায় কাঠ কাটা হচ্ছে করাতে। কিন্তু কুটিরের ভেতর সব আগের মতোই নিঝুম।

জেনিয়া দেখল তার মাথার নীচে চামড়ার নরম বালিশ, হালকা চাদরে পা ঢাকা আর কুকুরটা নেই।

তার মানে রাত্তিরে কেউ সেখানে এসেছিল!

জেনিয়া উঠে পড়ল। চুল উলটিয়ে দলা-মোচড়া ফ্রকটা টান করে চাবি আর না-পাঠানো টেলিগ্রামটা নিয়ে বেরোতে যাবে কি টেবিলের ওপরে একটা চিরকুট নজরে পড়ল। তার ওপর নীল পেন্সিলের বড় বড় হরফে লেখা:

'খুকি! যাবার সময় দরজাটা শক্ত করে এ'টে দিও।' নীচে সই — 'তিমুর'।

তিমুর? কে এই তিমুর? তাকে খুঁজে বার করে ধন্যবাদ দিতে হবে তো।

পাশের ঘরে তাকাল সে। সেখানে ছিল লেখার টেবিল। তার ওপর লেখার সরঞ্জাম, ছাইদানি আর ছোটো একটা আয়না। ডান দিকটায় একজোড়া চামড়ার দস্তানার পাশে আছে একটা পুরোনো জীর্ণ রিভলভার। টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো আঁচড়-লাগা দাগ-ধরা খাপে-ঢাকা এক তুর্কি তলোয়ার। জেনিয়া ঘরে ঢুকে চাবি আর টেলিগ্রাম রেখে তলোয়ারে হাত দিল। তারপর খাপ থেকে তলোয়ার খুলে মাথার ওপর ঘুরিয়ে আয়নার দিকে তাকাল।

বেশ ভয়ংকর দেখাচ্ছিল তাকে। এই ভঙ্গিতে একটা ছবি তুলে স্কুলের ছোট ছেলেমেয়েদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালে কি মজাই না হয়! মিছে করে সে বলে বেড়াতেও পারবে যে বাবা তাকে একবার যুদ্ধে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাঁ হাতে রিভলভারটা ভালই মানাবে। এই যে এমনিভাবে। এবার আরও ভাল দেখাচ্ছে যেন। যতদূর পারে ভ্রূ কুঁচকে ঠোঁট কামড়ে আয়নার দিকে তাক করে সে ঘোড়া টিপল।

কানে তালা-লাগা আওয়াজে ঘর ফেটে পড়ল। ধোঁয়ায় ছেয়ে ফেলল জানালা। আয়না ছিটকে পড়ল ছাইদানির ওপর। তীরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে জেনিয়া সেই বিভীষিকাময় ভুতুড়ে বাড়ি ছেড়ে প্রাণপণে ছুটে পালাল। টেবিলের ওপরের চাবি আর টেলিগ্রাম নেবার কথা মনেই রইল না তার।

কেমন করে যেন সে হাজির হল এক নদীর ধারে। হাতে তার না ছিল মস্কো ফ্ল্যাটের চাবি, না টেলিগ্রাম কি টেলিগ্রামের রসিদ। উপায় নেই, ওলগাকে এখন বলতে হবে সবকিছু: কুকুরটার কথা, খালি বাড়িতে ঘুমানোর কথা, তুর্কি

তলোয়ারের আর সকলের শেষে গুলির কথা। বিশ্রী ব্যাপার যত! বাবা থাকলে এসব বুঝতে পারতেন। কিন্তু ওলগা বুঝবে না। সে হয়ত রাগে জ্বলে উঠবে — নয়ত তার চেয়েও যেটা খারাপ — কেঁদেই ভাসাবে। সে হবে সাংঘাতিক! জেনিয়াও জানে কি করে কাঁদতে হয়। কিন্তু ওলগাকে কাঁদতে দেখলেই তার ইচ্ছে হয় গিয়ে টেলিগ্রাফের থামের মাথায়, কি কোন উঁচু গাছে নয়ত কোন চিমনি বেয়ে ওঠে।

সাহস সঞ্চয়ের জন্যে জেনিয়া একটু ডুব দিয়ে নিল। তারপর ধীরে ধীরে চলল তাদের বাগান-বাড়ির সন্ধানে।

জেনিয়া যখন দাওয়ার সিঁড়িতে পা দিয়েছে ওলগা তখন রান্নাঘরে প্রাইমাস স্টোভ জ্বালাচ্ছে। পায়ের শব্দ কানে যেতেই সে ঘুরে কোন কথা না বলে কটমট করে জেনিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল।

সিঁড়ির শেষ ধাপে থেমে গিয়ে জোর করে মুখে হাসি টেনে জেনিয়া বলল, 'এই যে ওলিয়া! বকবে না তো আমায়? বল?'

'বকবই তো!' জেনিয়ার মুখ থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে উত্তর দিল ওলগা।

একান্ত নিরীহের মতো জেনিয়া বলল, 'বেশ বকো তাহলে। জানতে যদি কি অদ্ভুত বিপদে পড়েছিলাম আমি! ওলিয়া, চোখ পাকিও না বাবা! খালি ঘরের চাবিটা হারিয়ে ফেলেছি আর বাবাকে টেলিগ্রামটা পাঠান হয় নি...'

ঢোক গিলে চোখ কুঁচকে জেনিয়া এক নিঃশ্বাসে সে কাহিনী বলতে আরম্ভ করল।

কিন্তু ঠিক তক্ষুনি ক্যাঁচ্ করে ঘরের সামনেকার ফটক খুলে গেল। সারা গায়ে ওকড়া জড়িয়ে একটা লোমশ ছাগল গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকেই শিং নীচু করে ছুটল বাগানের পেছন দিকটায়। তার ঠিক পেছনেই একটি মেয়ে খালিপায়ে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়াচ্ছিল। এর সঙ্গেই কাল জেনিয়ার দেখা হয়েছিল।

এই সুযোগে অস্বস্তিকর আলাপ বন্ধ করে জেনিয়াও ছাগল ধরতে ছুটল বাগানে। মেয়েটি হাঁপাতে হাঁপাতে সবে ছাগলটার শিং ধরেছে এমন সময় জেনিয়া এসে তার সঙ্গ ধরল।

'বল তো তোমার কিছু খোয়া গেছে নাকি?' ছাগলটাকে কিল চড় লাথি মারতে মারতেই সেই ছোট্ট মেয়েটি দাঁতের ফাঁকে জিজ্ঞাসা করল জেনিয়াকে।

না বুঝে জেনিয়া উত্তর দিল, 'না তো।'

'তাহলে এটা কার, তোমার নয়?' বলেই সে তাকে মস্কোর বাড়ির চাবিটা দেখাল।

সশঙ্ক দৃষ্টিতে বারান্দার দিকে তাকিয়ে জেনিয়া ফিসফিস করে বলল, 'হ্যাঁ আমার।'

আগের মতোই দাঁতের ফাঁকে মেয়েটি তড়বড় করে বললে, 'তাহলে চাবি, চিরকুট আর রসিদটা নাও। আগেই তোমার টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

কাগজের একটা ছোট্ট মোড়ক জেনিয়ার হাতে দিয়ে সে আবার ছাগলটাকে ঘুসি মারতে লাগল।

ছাগলটা ফটকের দিকে পালাল। মেয়েটিও খালিপায়ে তীরবেগে ছায়ার মতো তার পেছনে পেছনে কাঁটাগাছ আর বিছুটিবন ভেঙে ছুটল। এক পলকেই ফটক পেরিয়ে উধাও হয়ে গেল তারা।

জেনিয়া মোড়কটা খুলল। এমনভাবে ঘাড় কুঁচকে খুলল যেন ছাগলের বদলে সেই মার খাচ্ছিল এতক্ষণ।

'এইতো! চাবি আর টেলিগ্রামের রসিদ। তার মানে কেউ এটা পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কে পাঠাবে? আরে! এই যে একটা চিরকুট। কি আছে এতে?'

নীল পেন্সিলের বড় বড় হরফে চিরকুটে লেখা:

'খুকি! ভয় নেই। সব ঠিক আছে। আমি কাউকে কিচ্ছু বলব না।' নীচে সই — 'তিমুর'।

আচ্ছন্নের মতো জেনিয়া নিঃশব্দে চিরকুটটা পকেটে পুরল। তারপরে কাঁধ টান করে ফিরে এল ওলগার কাছে।

সেখানে প্রাইমাসের পাশে ওলগা তখনও সেই একই জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়েছিল। প্রাইমাসটি তখনো জ্বালানো হয় নি। তার দুচোখ জলে ভরা।

সখেদে জেনিয়া বললে, 'ওলিয়া! আমি যে ঠাট্টা করছিলাম। রাগ করার কী আছে? ঘর, দোর, জানালা সমস্ত পরিষ্কার করেছি ধুয়ে মুছে। কত খেটেছি জানো। যত সব কাপড়চোপড় কেচে মেজে ধুয়ে সাফ করেছি। এই নাও চাবি আর বাবার টেলিগ্রামের রসিদ। দাও, তোমায় একটা চুমু খাই? জানো তোমায় কত ভালোবাসি! বলো তো দ্যাখো, এক্ষুনি আমি তোমার জন্যে ছাদের ওপর থেকে বিছুটিবনে লাফিয়ে পড়ব?'

ওলগার উত্তরের অপেক্ষা না করেই জেনিয়া তার গলা জড়িয়ে ধরল।

'তা... দুশ্চিন্তা তো হয়ই।' হতাশ হয়ে জবাব দিল ওলগা। 'সব সময় যতসব বেয়াড়া ঠাট্টা তোর। আর বাবা আমাকে বলে গেছেন... জেনিয়া, ছাড় বাপু! জেনিয়া, দোহাই তোর! আমার দু হাত কেরোসিনে মাখা! বরং ডেকচিটাতে একটু দুধ ঢেলে স্টোভে জ্বাল দিতে বসিয়ে দে না!'

ওলগা গিয়ে দাঁড়াল হাত ধোওয়ার জায়গার কাছে আর জেনিয়া বিড়বিড় করে বলল, 'আমি... আমি যে ঠাট্টা না করে থাকতে পারি না।'

দুধের ডেকচি প্রাইমাসে বসিয়ে দিয়ে পকেটের চিরকুটটায় হাত বুলিয়ে সে বলল, 'আচ্ছা ওলিয়া, ভগবান আছেন?'

কলের নিচে মাথা নামিয়ে ওলগা উত্তর দিল, 'না।'

'কে আছে তাহলে?'

'আর জ্বালাস না আমাকে!' ওলগা বিরক্তিভরে খেঁকিয়ে উঠল, 'কেউ নেই!'

জেনিয়া এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপরেই আবার শুরু করল, 'আচ্ছা ওলিয়া। তিমুর* কে?'

'ভগবান নয় — একজন রাজা।' হাতে মুখে সাবান মাখতে মাখতে গজ্‌গজ্‌ করে জবাব দিল ওলগা। 'মধ্য যুগের এক শয়তান খোঁড়া রাজা।'

'কিন্তু ঐ তিমুর যদি রাজা, কিংবা শয়তান কি মধ্য যুগেরও কেউ না হয়, তাহলে, সে কে?'

'তাহলে জানি না। রেহাই দে আমায়! কিন্তু তিমুরকে নিয়েই বা এত মাতামাতি কেন তোর?'

'কারণ তাকে বোধ হয় খুব ভালোবাসি আমি।'

'কাকে?' ওলগা তার সাবান মাখা মুখটা তুলে হতভম্বের মতো জিজ্ঞাসা করল। 'কি এসব বকবক করছিস? কি বলছিস সব আজেবাজে? মুখটাও ধুতে দিবি না শান্তিতে? বাবা আগে আসুন বাড়িতে! তখন দেখাবেন তোর ভালোবাসা।'

'বেশ তো, আসুন না বাবা?' ম্লান স্বরে বলে উঠল জেনিয়া। 'তিনি এলেও বেশি দিনের জন্যে তো আসবেন না। আর তাহলেও তিনি নিশ্চয়ই দুর্ব্যবহার করবেন না অসহায় একলা লোকের সঙ্গে।'

ওলগা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কে অমন একলা অসহায় হল? তুই? সত্যি, জেনিয়া, তোকে নিয়ে যে কি করব। কার মতো যে হলি তা মাথাতেই আসে না আমার!'

জেনিয়া মুখ নীচু করল। চায়ের কেৎলির নিকেল-করা গায়ে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে দেখতে অসঙ্কোচে, গর্বভরে উত্তর দিল, 'বাবার মতো। হুবহু বাবার মতো। একেবারে। জগতের আর কারুর মতো নয়।'

---

* মধ্য যুগের দিগ্বিজয়ী তৈমুর লঙ্গ, রুশে পরিচিত তিমুর নামে। — সম্পাঃ

প্রৌঢ় ভদ্রলোক ডাঃ ফ. গ. কলোকলচিকভ নিজের বাগানে বসে একটা দেয়াল-ঘড়ি মেরামত করছিলেন।

বিষণ্ণ মুখে নাতি কলিয়া তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল।

ঠাকুর্দাকে সাহায্য করার কথা কলিয়ার। অথচ আসলে কখন ঠাকুর্দার দরকার হবে এই জন্যে সে ঘণ্টাখানেকের বেশি হল একটা স্ক্রুড্রাইভার হাতে করে কেবল দাঁড়িয়েই আছে।

অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ঠাকুর্দা ইস্পাতের বেয়াড়া সর্পিল স্প্রিংটির পেছনে লেগেছিলেন। কিছুতেই সেটা জায়গামাফিক বসতে চাইছিল না। এই অপেক্ষার শেষ নেই বলে মনে হচ্ছিল কলিয়ার। কি পরিতাপের কথা! বিশেষ করে পাশের বাড়ির বেড়ার আড়াল থেকে কয়েকবার সিমা সিমাকভের ঝাঁকড়া মাথাটা ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে। তাছাড়া সিমা হল যেমন চটপটে তেমনি সবজান্তা। জিভ, মাথা আর আঙুল দিয়ে সিমা এমন সব অদ্ভুত রহস্যময় সংকেত পাঠাচ্ছিল কলিয়ার উদ্দেশে যে, লিন্ডেনগাছের নীচে বসে কলিয়ার পাঁচ বছরের যে বোন তাতিয়ান্কা একমনে এক আলসে গা-এলানো কুকুরের মুখে শালগম ঢোকাবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল সে হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদেই ঠাকুর্দার প্যাণ্ট ধরে টান দিল। ফলে সিমা সিমাকভের মাথা মুহূর্তের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

অবশেষে স্প্রিংটা ঠিক মতো বসানো গেল।

পক্বকেশ বৃদ্ধ ঘর্মাক্ত কপাল তুলে কলিয়াকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মানুষকে খাটতে হয়, পরিশ্রম করা দরকার। কিন্তু তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন এক দাগ ক্যাস্টর অয়েল গেলাচ্ছি। স্ক্রুড্রাইভার আমাকে দিয়ে সন্নাটা নিয়ে যা। পরিশ্রমই লোককে মর্যাদা দেয়। আর ঠিক মনের এই উদারতারই অভাব হচ্ছে তোর। ধর যেমন কালকে চার চারটে আইসক্রীম তুই নিজে খেলি অথচ তোর ছোট্ট বোনটিকে একটাও দিলি না।'

'মিথ্যে কথা বলেছে ও, বেহায়া কোথাকার!' কলিয়া রাগে চেঁচিয়ে উঠল। চোখ পাকিয়ে সে তাকাল তাতিয়ান্কার দিকে। 'আমি তিন তিনবার ওকে দু' কামড় করে খেতে দিয়েছি। আর ও কিনা গিয়ে আমার নামে লাগায়! তার ওপর মামণির টেবিল থেকে চার কোপেকটাও মেরে দিয়েছে।'

'আর তুমি যে কাল রাত্তিরে দড়ি বেয়ে জানালা গলে নেমে গেলে?' অবিচলিত স্বরে ঘাড় না ফিরিয়ে তাতিয়ান্কা বলে দিল। 'আর তোমার বালিশের নিচে টর্চ আছে। তাছাড়া কালকে একটা পাজি ছেলে জানালা দিয়ে আমাদের শোবার ঘরে ঢিল ছুঁড়েছিল। ঢিল মারে আর শিস দেয়।'

বেহায়া তাতিয়ান্কার এই নতুন আস্পর্ধা দেখে কলিয়া কলোকলচিকভের দম

বন্ধ হয়ে এল; আপাদমস্তক কাঁপতে লাগল তার। ভাগ্য ভাল, ঠাকুর্দা এত ব্যস্ত ছিলেন যে এই সাংঘাতিক অপবাদে তিনি কান দেন নি, নয়ত বা শুনতেই পান নি একেবারে।

ভাগ্যক্রমে ঠিক তখনি গয়লানীও দুধ নিয়ে এল বাগানে।

ঠিক মতো করে, দুধ মাপতে মাপতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, 'জানেন গো ফিওদর গ্রিগোরিয়েভিচ, কাল রাত্তিরে আমার উঠোনে কয়েকটা চোর এসে ওক কাঠের পিপেটা প্রায় সরিয়ে ফেলেছিল আর কি। আজ লোকজন বলাবলি করছিল খুব ভোরে নাকি দুজন লোককে আমার ছাদে দেখেছে। ভেবে দেখুন একবার। চিমনির ওপরে বসে পা দোলাচ্ছিল হতচ্ছাড়ারা।'

'চিমনির ওপরে? কিন্তু তার উদ্দেশ্যটা কি?' জানতে চাইলেন হতবুদ্ধি ভদ্রলোকটি।

ঠিক সেই মুহূর্তেই মুরগীর ঘরের ওদিক থেকে এল একটানা কানফাটা, ঝনঝন একটা আওয়াজ। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের হাতে স্ক্রুড্রাইভারটা কেঁপে গেল। একরোখা স্প্রিংটাও তার খোপ থেকে খসে লাফিয়ে লোহার ছাদে গিয়ে ঠেকল ঢং করে। কোত্থেকে আসছে আওয়াজটা, কী ব্যাপার বুঝতে না পেরে সবাই এমনকি আলসে কুকুরটাও, এমনকি তাতিয়ান্কাও চমকে একসঙ্গে মাথা ফেরালে। সঙ্গে সঙ্গেই একটি কথা না বলে কলিয়া কলোকলচিকভ গাজর ক্ষেতের ওপর দিয়েই হন্তদন্ত হয়ে খরগোসের মতো একদৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বেড়ার আড়ালে।

একটা গোয়ালের পাশে এসে সে থামল। এখান থেকেও ঐ মুরগীর ঘরের মতো তীক্ষ্ন একটা আওয়াজ বেরোচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কে যেন একখণ্ড ইস্পাতের রেলের উপর বাটখারার ঘা মারছে। এখানেই সিমা সিমাকভের সঙ্গে দেখা হতেই উত্তেজিতভাবে তাকে সে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার বল তো? ঠিক বুঝতে পারছি না। এটা কি বিপদ-সঙ্কেত?'

'না! আমার মনে হয় এটা এক নম্বর সাধারণ জমায়েতের ঘণ্টা।'

বেড়া ডিঙিয়ে পার্কের খুঁটোর ফোকর দিয়ে বেরতেই দেখা হল গেইকা বলে শক্তসমর্থ চওড়া কাঁধওয়ালা বেঁটে-খাটো এক ছেলের সঙ্গে। পেছু পেছু ছুটে এল ভাসিলি লাদিগিন; তারপর আরও অনেকে। একেবারে নিঃশব্দে খুব তাড়াতাড়ি তারা গন্তব্যের দিকে ছুটল একমাত্র তাদেরই চেনা একটা পথ ধরে। দৌড়তে দৌড়তে শুধু টুকরো টুকরো কথা হচ্ছিল তাদের:

'এটা কি বিপদ-সঙ্কেত?'

'ন্-না, এটা এক নম্বর সাধারণ জমায়েতের ঘণ্টা।'

'জমায়েত কোথায়? তাহলে তো তিনবার করে বেজে একবার করে থামত। এ কোন পাগল যেন এক নাগাড়ে দশবার করে বাজিয়ে চলেছে।'

'বেশ তো, দেখাই যাবে।'

'ঠিক আছে দেখা যাবে।'

'আরও জোরে — জোর কদম!'

সেই সময় প্রায় বছর তেরো বয়সের কাল চুলওয়ালা একটি লম্বা ছেলে দাঁড়িয়েছিল সেই ঘরে যেখানে জেনিয়া রাত কাটায়। তার পরনে পাতলা কালো প্যাণ্ট আর কালচে নীল ফতুয়া, তার ওপর একটা লাল তারা এমব্রয়ডারী করা।

এলোমেলো পাকাচুলো এক বৃদ্ধ এলেন তার কাছে, মোটা কাপড়ের সার্টটি তাঁর দীনহীন, ঝোলা প্যাণ্টটা তালিতে ভর্তি। বাঁ হাঁটুর সঙ্গে ফিতে দিয়ে বাঁধা একটা এবড়োখেবড়ো কাঠের পা। একহাতে একটা চিরকুট ধরে আছেন, আর অন্য হাতের মুঠিতে একটি পুরনো টোল-খাওয়া রিভলভার।

'খুকি। যাবার সময় দরজাটা শক্ত করে এ'টে দিও।' ব্যঙ্গ করে পড়লেন তিনি। 'আছ বেশ, তা সোফার ওপর কে রাত কাটিয়েছিল শুনি?'

ছেলেটি একান্ত অনিচ্ছায় জবাব দিল, 'আমার চেনা একটি মেয়ে। আমি বাড়ি ছিলাম না, কুকুরটা তাকে বেরোতে দেয় নি।'

'মিথ্যে কথা!' রাগত স্বরে বৃদ্ধ বললেন। 'চেনা মেয়ে হলে তার নাম ধরেই চিঠি লিখতিস।'

'এটা লেখবার সময় তার নাম জানতাম না। এখন জানি।'

'জানতিস না, না? আর তাকে সকালে একাই ঘরে ফেলে গেলি? শোন বাপু, তোর মাথায় দেখছি কিছু গোলমাল আছে। তোকে পাগলা গারদে পাঠানোই উচিত। সেই অকর্মার ঢেঁকিটা আয়নাটা ভেঙেছে, ছাইদানিটা টুকরো টুকরো করেছে। ভাগ্যে রিভলভারে ফাঁকা গুলি-ভরা ছিল। সত্যিকার তাজা কার্তুজ হলে কি হত?'

'কিন্তু কাকাবাবু... আপনি তো এমনিতেই সত্যিকার কার্তুজ রাখেন না। আপনার শত্রুদের তলোয়ার বা রাইফেল... সবই তো কাঠের।'

বৃদ্ধের সারা শরীরে যেন হাসির একটা ঝিলিক খেলে গেল। কিন্তু তিনি তাঁর উষ্কখুষ্ক মাথা নেড়ে কড়া করে জবাব দিলেন:

'খেয়াল থাকে যেন! সবকিছুই আমার নজরে পড়ে। বেশ বুঝতে পারছি কি

এক নষ্টামির ফন্দি আঁটছিস। সাবধান, তোকে আবার মায়ের কাছে ফেরত পাঠিয়ে না দিই।'

বৃদ্ধ ঠক্‌ঠক্ করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন। তিনি যাবামাত্রই ছেলেটি তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠল। ঠিক তখনই কুকুরটাও ভেতরে ঢুকল। তিমুর তার থাবাদুটো ধরে চুমু খেল তার মুখে।

'বুঝলি রিতা, তুই আর আমি আজ ধরা পড়ে গিয়েছি রে! তবে ভাবনা নেই, আজ ওঁর মেজাজটাও ভাল দেখছি। মিনিটখানেকের মধ্যেই গান ধরলেন বলে।'

সত্যিই তাই। ওপরের ঘর থেকে শোনা গেল গলা খাঁকারির আওয়াজ। তারপর এক গদ! অবশেষে নিচু স্বরিত গলায় গান:

তিনরজনী ঘুম আসে না কেবল মনে হয়
করাল নীরবতার মাঝে কিসের গূঢ় সাড়া...

'থাম থাম, পাগলা!' তিমুর চেঁচিয়ে উঠল। 'প্যাণ্ট ধরে টানছিস কেন, কোথায় নিয়ে যেতে চাস?'

ওপরে কাকার ঘরে যাবার দরজাটা আচমকা দম্ করে বন্ধ করেই সে কুকুরটার পেছু পেছু করিডর দিয়ে ছুটে গেল বারান্দায়।

বারান্দার এক কোণায়, ছোট একটা টেলিফোনের পাশে দেয়ালের সঙ্গে টাঙান ছিল তারে বাঁধা ব্রোঞ্জের একটা ঘণ্টি; সেটা দুলে দুলে দেওয়ালের সঙ্গে ঠোকা লেগে বাজছিল।

ছেলেটি ঘণ্টিটা হাত দিয়ে চেপে ধরে তারটা পাকিয়ে রাখল পেরেকের গায়ে। তারের দোলানি থেমে গেল এবং সেটা ঝুলে পড়ল, — বোধহয় কোথাও ছিঁড়ে গিয়েছিল। রেগেমেগে কিছু ঠাহর করতে না পেরে সে রিসিভারটা তুলে নিল।

যখন এই সব ঘটে তার ঘণ্টাখানেক আগে টেবিলের উপর পদার্থবিদ্যার পাঠ্য বইখানা সামনে নিয়ে বসেছিল ওলগা।

জেনিয়া ভেতরে ঢুকেই আয়োডিনের ছোট্ট শিশিটা তুলে নিল।

অসন্তুষ্ট স্বরে জিজ্ঞাস করল ওলগা:

'জেনিয়া, তোর কাঁধের ওপর আঁচড় লাগল কেমন করে রে?'

জেনিয়া গ্রাহ্য না করে জবাব দিল, 'আসবার সময় কাঁটা বা ধারালো কি যেন লাগল, বাস।'

জেনিয়ার স্বর নকল করে ওলগা ভেঙচে বলল, 'কই, আমার পথে তো অমন কাঁটা কি ধারালো কিছু পড়ে না।'

'পড়ে বইকি! তোমার সামনেই তো রয়েছে অঙ্কের পরীক্ষা। যেমন কাঁটা-ভরা তেমনি ধারালো? দেখো, হোঁচট খেয়ো না যেন!.. ওলিয়া, তুমি বাপু ইঞ্জিনিয়ার হয়ো না বরঞ্চ ডাক্তার হয়ো, বুঝলে?' দিদির দিকে একটা ছোট্ট আয়না গুঁজে দিয়ে জেনিয়া বকবক করে চলল, 'দেখোই না একবার নিজের দিকে তাকিয়ে, ইঞ্জিনিয়ার আবার কোথায়? ইঞ্জিনিয়ারের হবে — এমনি... এমনি... এমনি...' (এই বলে সে সতেজ তিনটে মুখভঙ্গি করল।) 'আর তোর শুধু... এমনি... আর এমনি।' চোখ নাচিয়ে ভুরু তুলে ললিত ভঙ্গিতে হাসল জেনিয়া।

'বোকাটা!' বলে ছোট্ট বোনটিকে আদর করে চুমু খেলে ওলগা। তারপর আস্তে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'যা জেনিয়া, আমায় জ্বালাস না। বরঞ্চ কুয়ো থেকে একটু জল আনলে কাজের কাজ করবি।'

প্লেট থেকে একটা আপেল তুলে নিয়ে জেনিয়া এক কোণে সরে গেল। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জানালার কাছে।

তারপর এ্যাকর্ডিয়নের বাক্স খুলে বলল, 'জান ওলিয়া, এক ভদ্রলোক আজ আমার কাছে এসেছিলেন। তা দেখতে মন্দ নয়, সোনালী চুল, সাদা স্যুট-পরা। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি, খুকি? আমি বললাম, জেনিয়া।'

'জেনিয়া বিরক্ত করিস না আর বাজনাটা রেখে দে দিকি।' বই থেকে মুখ না তুলে, ঘাড় না ফিরিয়েই বলল ওলগা।

এ্যাকর্ডিয়নটা নিয়ে জেনিয়া বলে চলল, 'বললেন, আর তোমার দিদির নাম তো ওলগা, তাই না?'

'জেনিয়া, বিরক্ত করিস না, বাজনাটা রেখে দে বলছি!' শুনবার জন্যে অজ্ঞাতসারে কান পেতে রেখেই পুনরুক্তি করল ওলগা।

'বললেন, তোমার দিদি তো খুব ভাল বাজান। সঙ্গীত বিদ্যালয়ে ভর্তি হবেন নাকি?' (জেনিয়া এ্যাকর্ডিয়নটা বাক্স থেকে বার করে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল।) 'আমি তাকে বললাম, না, সে এর মধ্যেই কংক্রীটবিদ্যার পাঠ নিচ্ছে। তখন তিনি বললেন, ও!' (জেনিয়া এ্যাকর্ডিয়নের একটা চাবি টিপল।) 'আমি বললাম, ব্যাঁ!' (জেনিয়া আর একটা চাবি টিপল।)

'কি সাঙ্ঘাতিক মেয়ে রে বাবা!' তড়াক করে উঠে ওলগা বলল, 'বাজনাটা রাখবি কিনা, অজানা লোকের সঙ্গে কথা বলতে কে বলেছে তোকে?'

অভিমানভরে জেনিয়া বলল, 'বেশ রেখে দিচ্ছি এটা। কথা বলতে আমি যাই নি। তিনিই শুরু করেন। বাকিটুকু তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম। তবে এখন আর বলব না। বাবা বাড়ি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর, তিনিই তোমাকে মজাটা দেখাবেন!'

'আমাকে? তোকেই দেখাবেন বাবা। পড়তে দিচ্ছিস না আমাকে একেবারে।'

'মোটেই না। তোমাকেই দেখাবেন!' খালি বালতি নিয়ে বাইরে অলিন্দ থেকে চেঁচিয়ে উঠল জেনিয়া। 'বাবাকে বলে দেব দিনে একশবার করে কখনো কেরোসিন, কখনো সাবান, কখনো জল আনতে পাঠাও! আমি তোমার ট্রাকও নই, ঘোড়াও নই, ট্র্যাক্টরও নই!'

বালতি ভরে জল নিয়ে এসে জেনিয়া বেঞ্চির ওপর রাখল। কিন্তু ওলগা ওর দিকে কোনো নজর না দিয়ে থেকে মুখ তুলল না দেখে সে ক্ষুণ্ণ মনে বাগানে চলে গেল।

বেড়াতে বেড়াতে সে পুরোনো দোতলা গোলাবাড়িটার সামনে খোলা সবুজ জায়গাটায় এসে পড়ল। পকেট থেকে গুল্‌তি বের করে রবারের ফিতে টেনে প্যারাশুট লাগানো কার্ডবোর্ডের এক ক্ষুদে পুতুল ছুঁড়ে মারল আকাশের দিকে।
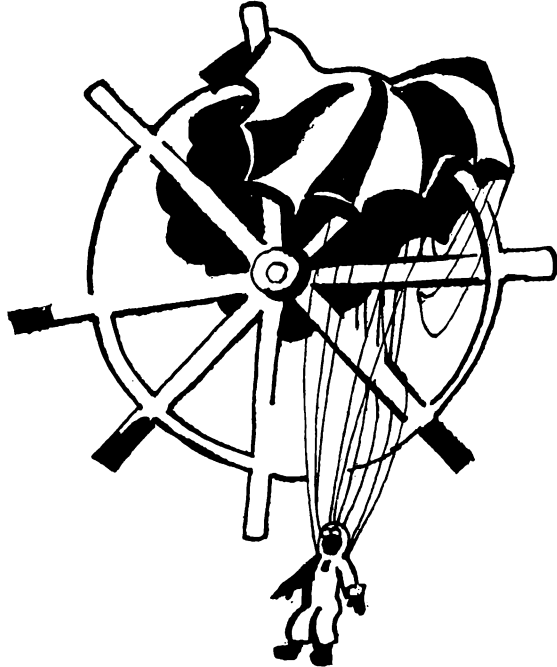
মাথা নীচের দিকে করে আকাশে ওড়বার সময় পুতুলটা একবার ডিগ্‌বাজি খেল। নীল কাগজের প্যারাশ্যুট গজিয়ে উঠল তার মাথায়। কিন্তু ঠিক তক্ষুনি দমকা হাওয়া তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল গোলাবাড়ির টঙের জানালার অন্ধকারে।

ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা! কার্ডবোর্ডের মানুষকে যে বাঁচাতে হয়! গোলাবাড়ির চারিদিকে ছুটোছুটি করল জেনিয়া। তার ছাদের চারিদিক থেকে দড়াদড়ি নেমেছে। সে একটা নড়বড়ে মই নিয়ে এল টেনে। মইটা জানালার গায়ে লাগিয়ে সেটা বেয়ে উপরে উঠে গেল জেনিয়া। তারপর ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল টঙের মেঝেয়।

আরে, অবাক কান্ড! টঙে যে লোক থাকে। দেয়ালে টাঙানো রয়েছে দড়ির বান্ডিল, একটা লণ্ঠন, দুটো সাঙ্কেতিক নিশান, আর উদ্ভট উদ্ভট চিহ্ন আঁকা স্থানীয় একটা মানচিত্র। এক কোণে রয়েছে চটে-ঢাকা স্তূপাকার খড় আর একটা ওল্টানো কাঠের বাক্স। শ্যাওলা-ঢাকা ফুটো ফুটো চালাটার কাছে দেওয়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে জাহাজের হালের মতো বড় একটা চাকা। তার ঠিক ওপরেই ঝুলছে হাতে তৈরি একটা টেলিফোন।

জেনিয়া দেওয়ালের ফাটলে উঁকি মেরে দেখল। বাইরে ঘন গাছপালা দুলছে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, পায়রার ঝাঁক উড়ছে আকাশে। জেনিয়া অমনি মনে মনে ধরে নিল: পায়রাগুলো হোক গাংচিল, আর দড়ি, লণ্ঠন, নিশান সমেত পুরোনো গোলাবাড়িটা মস্তবড় একটা জাহাজ। সে যেন তার ক্যাপ্টেন।

ভীষণ ফুর্তি লাগল। চাকাটা সে ঘুরিয়ে দিল। টানটান দড়িদড়াগুলো কাঁপতে কাঁপতে গুনগুন শব্দ করে উঠল। বাতাস শন শন করে সবুজ ঢেউগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল। মনে হল তার গোলাবাড়ি-জাহাজখানা ধীরে ধীরে শান্ত ভাবে বাঁক নিচ্ছে।

'হুইল ঘোড়াও বাঁয়ে!' জোরে হাঁক দিয়েই জেনিয়া ভারি চাকাটার উপর তার সারা শরীরের ভর দিল।

ঠিক তখনি সূর্যের কয়েকটি সরু রশ্মি ছাদের ফুটো দিয়ে গলে সোজা ঠিকরে এসে পড়ল তার মুখে এবং ফ্রকে। কিন্তু জেনিয়া বুঝল সেগুলো আর কিছু নয় শত্রুপক্ষের সন্ধানী আলো — তাকে যেন খুঁজছে। ঠিক করল সে যুদ্ধই করবে।

ক্যাঁচকোঁচ-করা চাকাটাকে কখনো ডাইনে কখনো বাঁয়ে ঘুরিয়ে মহড়া নিয়ে নিয়ে সে হুকুমজারী করে চলল।

একটু পরেই সেই সন্ধানী আলোর তীক্ষ্ম রশ্মি স্তিমিত হতে হতে মিলিয়ে গেল। অবশ্যই তার মানে এই নয় যে সূর্য মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। তার মানে বিধ্বস্ত শত্রুবহর অতলে ডুবে যাচ্ছে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। ধুলো-মাখা হাতের তেলো দিয়ে জেনিয়া মুছে নিল কপালটা। এমন সময় হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। জেনিয়ার সেটা কল্পনাতেও আসে নি। সে ভেবেছিল ওটা খেলনার টেলিফোন। এবারে সে ভয় পেল। রিসিভারটা তুলল সে।

একটা কর্কশ রাগী গলা শোনা গেল, 'হ্যালো! হ্যালো! ওখানে কে? কোন গাধা তারগুলো ছিঁড়ে আবোল-তাবোল সংকেত পাঠাচ্ছে কেরে?'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জেনিয়া উত্তর দিল, 'গাধা নই। আমি জেনিয়া!'

ও পাশের গলার আওয়াজটা এখন যেন একটু ভয় পেয়েই তীক্ষ্নভাবে বলল, 'পাগলী মেয়ে! চাকা ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালাও শীগ্‌গির। এক্ষুনি ওরা দল বেঁধে এসে পড়বে, তখন তোমায় আর আস্ত রাখবে না।'

জেনিয়া রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। কিন্তু ততক্ষণে যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। জানালা দিয়ে একটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল — গেইকার মাথা, তারপর একে একে সিমা সিমাকভ, কলিয়া কলোকলচিকভ এবং আরও অনেকে ঝুপঝুপ করে ভেতরে নেমে এল।

ভড়কে গিয়ে জানালার কাছ থেকে পেছনে সরে এসে জেনিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'কে তোমরা? চলে যাও!.. এটা আমাদের বাগান। আমি তো তোমাদের এখানে আসতে বলি নি।'

কিন্তু কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছেলেদের অটুট একটি দল নীরবে এগিয়ে গেল জেনিয়ার দিকে। কোণঠাসা করছে দেখে জেনিয়া চ্যাঁচাতে লাগল।

সেই মুহূর্তেই জানালায় একটা ছায়া পড়ল। ছেলের দল ঘুরে দাঁড়িয়ে দু-ভাগ হয়ে গেল। জেনিয়া দেখল তার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে লম্বা কালো-চুল একটি ছেলে। তার গায়ে নীল একটা ফতুয়া আর সেই ফতুয়ার ওপর রক্ত তারকা এমব্রয়ডারি করা।

জোর গলায় সে বলল, 'আস্তে জেনিয়া! চেঁচাতে হবে না। কেউ তোমার গায়ে হাত দেবে না। আমরা তোমায় চিনি। আমি তিমুর।'

জল-ভরা চোখদুটো বড় বড় করে জেনিয়া সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমিই তিমুর! তার মানে কাল রাত্রে তুমিই আমার গায়ে চাদর ঢেকে দিয়েছিলে? তুমিই টেবিলের ওপর চিরকুট রেখেছিলে? তুমিই ফ্রণ্টে বাবার কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে চাবি আর রসিদ আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলে? কিন্তু কেন বলো তো? কোথা থেকে তুমি আমায় জানলে?'

জেনিয়ার হাত ধরে সে উত্তর দিল, 'শোনো, থেকে যাও এখানে আমাদের সঙ্গেই! বসে বসে মন দিয়ে সব শোন, তাহলেই সব বুঝতে পারবে।'

ছেলের দল তিমুরকে ঘিরে চটে-ঢাকা খড়ের গাদার উপর উবু হয়ে বসল। তিমুর সামনে একটা ম্যাপ খুলে ধরল।

নজরওয়ালা ওপরের ফুটোয় ঝোলানো একটা দড়ির দোলনায় গিয়ে বসল। তার গলা থেকে ঝুলছে টোল-খাওয়া একটা অপেরা দূরবীন।

গোপন সদরঘাঁটিতে যে অধিবেশনটি চলেছে জেনিয়া একপাশে বসে বসে সতর্ক কৌতূহলে তার কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগল।

তিমুর বক্তৃতা করছিল, 'ও, (জেনিয়াকে দেখিয়ে) যে তারগুলো ছিঁড়ে ফেলেছে সেগুলোকে কাল খুব ভোরে সকলে যখন ঘুমিয়ে থাকবে তখন উঠে আমি আর কলোকলচিকভ মেরামত করে দেব।'

'ওর ঘুমই ভাঙবে না।' গম্ভীরভাবে বলল গেইকা, মাথাটা তার মস্তবড়ো, গায়ে ডোরা-কাটা জাহাজী জার্সি। 'ওর তো শুধু সকালের খাবারের সময়েই ঘুম ভাঙে।'

'মিথ্যে কথা!' লাফিয়ে উঠে তোৎলাতে তোৎলাতে বলল কলিয়া কলোকলচিকভ। 'সকালে প্রথম আলো ফুটতেই আমার ঘুম ভাঙে।'

'প্রথম আলো কি দ্বিতীয় আলো আমি জানি না। তবে জানি উঠতে পারবে না ও।' জিদের সঙ্গে উত্তর দিল গেইকা।

ঠিক এই সময় দোলনার নজরওয়ালা শিস দিয়ে উঠল। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল ছেলের দল।

ধুলোয় পথ ঢেকে এক অশ্বারোহী গোলন্দাজবাহিনী আসছে। লোহা আর চামড়ার জাঁকালো সাজ-পরা তেজীয়ান ঘোড়াগুলো দ্রুত টেনে চলেছে সবুজ রঙের গোলাবারুদের বাক্স আর ছাই রঙের ত্রিপল-ঢাকা কামান।

রোদে-পোড়া, জলহাওয়ায় পোড়-খাওয়া সওয়ারের দল জিনের ওপর সটান বসেই স্বচ্ছন্দে বাঁকটা ঘুরে গেল। দলের পর দল গোলন্দাজ অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলে।

একটু পরে সমগ্র বাহিনীটাই চলে গেল দৃষ্টির বাইরে।

মাতব্বরি চালে কলিয়া কলোকলচিকভ বুঝিয়ে দিল, 'মাল বোঝাই করতে এরা যাচ্ছে রেল-স্টেশনে। ওদের পোশাক দেখেই আমি বলে দিতে পারি। কখন ট্রেনিঙে যাচ্ছে, কখন প্যারেড করতে, কখন-বা আর কিছুতে সবই আমি পারি বলে দিতে।'

গেইকা তাকে থামিয়ে দিল, 'দেখলি, বাস, চুপ করে থাক! চোখ আছে আমাদেরও। জানিস তোরা, কথার ঝুড়িটা আবার নাকি লাল ফৌজে যোগ দেবার জন্যে পালিয়ে যেতে চায়!'

তিমুর বাধা দিল, 'না, ও সব চলবে না। নিছক পাগলামি হবে।'

কলিয়া মুখচোখ লাল করে বলল, 'কেন চলবে না? আগের কালে তাহলে বাচ্ছারা কি করে প্রায়ই পালিয়ে যেত ফ্রণ্টে?'

'সে হল আগেকার কথা! এখন সেনানায়কদের কড়া হুকুম দেওয়া আছে বাচ্চাদের দেখলেই ঘাড় ধাক্কায় ভাগিয়ে দিতে হবে।'

'ঘাড় ধাক্কা মানে?' রাগে জ্বলে উঠে আরও লাল হয়ে চেঁচিয়ে উঠল কলিয়া কলোকলচিকভ। 'নিজেদের লোকদের?'

'হ্যাঁ, নিজেদের লোকদেরই!..' তিমুর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'নাও এস সব, কাজে লেগে পড়া যাক।'

ছেলেরা যে যার জায়গায় গিয়ে বসল।

কলিয়া কলোকলচিকভ ক্ষুব্ধ হয়ে জানাল, 'ক্রিভোয় গলির ৩৪ নং বাড়িতে যে বাগান আছে সেখান থেকে কতকগুলো ছোকরা আপেল গাছ ঝাঁকিয়েছে। তারা দুটো ডাল ভেঙেছে আর ফুলের ক্ষেত মাড়িয়ে নষ্ট করেছে।'

'কার বাড়ি ওটা?' বলে তিমুর নোট বইটা দেখল, 'লাল ফৌজের সৈনিক ক্রুকোভের বাড়ি। আচ্ছা, আমাদের মধ্যে কে আপেল চুরিতে আগে ওস্তাদ ছিলে?'

বিব্রত গলায় একটা আওয়াজ শোনা গেল, 'আমি।'

'এ কাজ কে করতে পারে?'

'মিশ্‌কা ক্‌ভাকিন আর তার শাগরেদ — যে গুণ্ডাটাকে সবাই 'হোৎকা' বলে ডাকে। তারা একটা মিচুরিন গাছকে সাফ করে দিয়েছে। গাছটায় 'রসমাধুরী' আপেল ধরত।'

'আবার সেই ক্‌ভাকিন?' তিমুর একটুখানি ভেবে নিল। 'গেইকা! তুমি কি ওর সঙ্গে কথা বলেছ?'

'বলেছি।'

'তা কী হল?'

'গর্দানে দু ঘা দিয়েছি লাগিয়ে।'

'আর সে?'

'সেও পাল্টে আমাকে ঘা দুয়েক ঠুকেছে।'

'তোর কেবল ঐ এক কথা। 'ঘা দুয়েক ঠুকেছে। দু ঘা দিয়েছি!..' তাতে কি মস্ত উপকারটা হল শুনি? ঠিক আছে বেশ! ক্‌ভাকিনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা যাবে আলাদাভাবে। তারপর আর কি খবর?'

কোণের থেকে একটি ছেলে খবর দিল, '২৫ নম্বরে যে বুড়ি গয়লানী থাকে, তার ছেলে ঘোড়সওয়ার-বাহিনীতে গেছে।'

'বড়ো বললে!' তিরস্কারের ভঙ্গিতে তিমুর মাথা নাড়ল, 'গেটের ওপর সেখানে আজ তিন দিন হল আমাদের সংকেত টাঙানো আছে। কে টাঙিয়েছে ওটা, কলোকলচিকভ, তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'তারার ওপরের বাঁ কোণটা অমন বানমাছের মতো বাঁকা হয়েছে কেন? কাজ যখন হাতে নিয়েছ ঠিক করে করবে। ওটা দেখলেই তো লোকে হাসবে। তারপর?'

সিমা সিমাকভ লাফিয়ে উঠে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তার বক্তব্য বলে গেল থতোমতো না খেয়ে, 'পুস্কারিওভা রাস্তার ৫৪ নং বাড়ির একটা ছাগল হারিয়ে গেছে। যাচ্ছি, দেখি এক বুড়ি ছোট্ট একটা মেয়েকে ধরে মারছে। বললাম, খুড়িমা, মারধোর করা বেআইনী। বুড়ি বলল, 'ও ছাগলটা হারিয়ে এসেছে। হতচ্ছাড়ী কোথাকার!' 'কোথায় হারিয়েছে?' 'ওইখানে জঙ্গলের পিছনের নালাটাতে। চিবিয়ে চিবিয়ে দড়িটা ছিঁড়ে চম্পট দিয়েছে। নেকড়ের পেটেই গেছে যেন।'

'দাঁড়া! বাড়িটা কার?'

'পাভেল গুরিয়েভের — সেও লাল ফৌজের সৈনিক। মেয়েটা তারই মেয়ে। নাম নিউর্‌কা। যে মারছিল সে তার ঠাকুরমা। নাম জানি না। ছাগলটা ছাই রঙের, পিঠটা কালো। ডাকে মান্‌কা বলে।'

তিমুর হুকুমজারী করল, 'ছাগলটা খুঁজে বের কর! চার জনের একটা দল যাবে। তুমি, তুমি, তুমি আর তুমি। তারপর? আর কিছু খবর নেই?'

গেইকা যেন অনিচ্ছাভরে জানাল, '২২ নম্বরে একটা মেয়ে কাঁদছিল।'

'কেন কাঁদছিল?'

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু সে কিছু বলল না।'

'আরও ভাল করে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল তোমার। হয়ত কেউ তাকে মেরেছে... বকেছে?'

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু সে কিছু বলল না।'

'বড় মেয়ে?'

'চার বছরের।'

'ভারি বিপদ! মাত্র চার বছরের, বড়ো হলেও নয় হত। আচ্ছা বাড়িটা কার?'

'লেফটেনাণ্ট পাভলভের। কিছুদিন আগে যিনি সীমান্তে খুন হয়েছেন।'

তিমুর গেইকাকে ভেঙচিয়ে বলল, 'বড়ো বললেন, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু সে কিছু বলল না।' ভ্রূ কুঁচকে সে একটু ভাবল। 'ঠিক আছে... ও বিষয়ে আমিই যা করার করব। তোমাদের আর এ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'

নজরওয়ালা চেঁচিয়ে উঠল, 'মিশ্‌কা ক্‌ভাকিনকে দেখা যাচ্ছে! আপেল খেতে খেতে রাস্তার ওধার দিয়ে যাচ্ছে। তিমুর, একটা দল পাঠিয়ে দাও, ওকে একটা কুৎকা দিয়ে আসুক!'

'কোন দরকার নেই। তোমরা সবাই যে-যার জায়গায় থাক। আমি এখনই ফিরে আসছি।'

মই বেয়ে নেমে সে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এবার নজরওয়ালা আর এক খবর দিল, 'ফটকে সুন্দর একটি মেয়েকে দেখতে পাচ্ছি। নাম জানি না। তার হাতে একটা কলসী, দুধ কিনছে। বোধ হয় এই বাগান-বাড়িটার মালিক।'

জেনিয়ার আস্তিন টেনে কলিয়া কলোকলাচিকভ জিজ্ঞেস করল, 'তোমার দিদি?' তারপর কোন উত্তর না পেয়ে আহত গম্ভীর সুরে জেনিয়াকে সাবধান করে সে বলল, 'দেখো যেন এখান থেকে ওকে চেঁচিয়ে ডেকো না।'

এক ঝাঁকিতে আস্তিন ছাড়িয়ে নিয়ে জেনিয়া বলল উপহাস করে, 'চুপ করে বসে থাক! ভারি এক মাতব্বর...'

গেইকা কলিয়াকে ক্ষেপাল, 'দেখিস পেছনে লাগিস না, নয়তো মেয়েটা তোকে পিটিয়ে ঢিট করবে।'

'কাকে? আমাকে?' আহত হল কলিয়া, 'কি আছে ওর? শুধু নখ। আর আমার, এই দেখ মাসল! এই দেখ হাতের, পায়ের মাসল!'

'তোর ওই হাতের পায়ের মাসল সমেত মেরে তোকে তক্তা করে দেবে। এই ছেলেরা, আস্তে! তিমুর ক্‌ভাকিনের কাছে যাচ্ছে।'

গাছের একটা ছোট ডাল আনমনে দোলাতে দোলাতে তিমুর ক্‌ভাকিনের পথ আগলিয়ে দাঁড়াল। তা দেখে ক্‌ভাকিন দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চ্যাপটা মুখে ভয় বা চমকের কোন ছাপই পড়ল না।

'কি হে, কমিসার!' ঘাড়টা একদিকে কাত করে শান্তভাবে সে বলল, 'কোথায় ছুটে চলেছ?'

'নমস্কার সর্দার! তোমার সঙ্গেই দেখা করতে।' একই সুরে জবাব দিল তিমুর।

'খুব খুসি হলাম। তবে অতিথিকে আপ্যায়নের কিছু নেই। শুধু এইটে ছাড়া, যদি চলে।' এই বলে জামার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সে একটা আপেল বার করল।

'চুরির নাকি?' আপেলে দাঁত বসিয়ে তিমুর জিজ্ঞাসা করল।

ক্ভাকিন বলল, 'ঠিক ধরেছ। 'রসমাধুরী'। একমাত্র অসুবিধা: এখনও ঠিকমতো পাকে নি।'

'যম টকরে বাবা!' তিমুর মুখ বিকৃত করে আপেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। 'শোন, ৩৪ নম্বরের বেড়ায় এই চিহ্নটা দেখেছ তো?' তিমুর তার নীল ফতুয়ার এমব্রয়ডারি-করা তারকা চিহ্নটা দেখাল।

'তা দেখেছি,' ক্ভাকিন সতর্ক হয়ে বললে। 'দিনে রাতে চোখ আমার খোলাই থাকে ভাই।'

'তাহলে বলে রাখছি, দিনে রাতে যখনই যেখানে এই চিহ্ন দেখবে সেখান থেকে প্রাণপণে ছুটে পালিও, যেন ফুটন্ত জল ঢালা হয়েছে তোমার গায়ে।'

'বাপরে কমিসার! বেজায় দেখছি রগচটা? তাই না?' টেনে টেনে ক্ভাকিন বলল। 'খুব হয়েছে উপদেশে!'

'আরে সর্দার, কী গোঁয়ারগোবিন্দ তুমি?' গলা না চড়িয়েই তিমুর বলল, 'এই কিন্তু শেষবারের মতো তোমার আমার মধ্যে কথা হল, সেটা নিজে ভাল করে মনে রেখ আর দলের বাকি সকলকেও জানিয়ে দিও।'

বাইরে থেকে কেউ ভাবতেই পারত না যে এরা দুজন মোটেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয় — ঘোরতর শত্রু। সেই জন্যে, কলসী হাতে ওলগা গয়লানীকে জিজ্ঞাসা করল কভাকিন গুণ্ডাটার সঙ্গে যে ছেলেটা কথা বলছে কে সে।

'কে জানে।' রাগ দেখিয়ে বললে গয়লানী, 'হয়ত ওই রকমই আর একটা গুণ্ডা আর হতচ্ছাড়া। প্রায় সারাক্ষণই তো দেখি ও তোমাদের বাড়ির চারপাশে ঘুর ঘুর করছে। খেয়াল রেখ বাছা যেন তোমার ছোট বোনটিকে ধরে পিট্টি না লাগায়।'

একটু ভাবনায় পড়ল ওলগা। দুটি ছেলের দিকেই ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে ফিরে এল বারান্দায়। তারপর দুধের কলসীটা নামিয়ে রেখে দরজায় তালা দিয়ে জেনিয়াকে খুঁজতে বেরোল। দু ঘণ্টারও ওপর হল জেনিয়া বাড়িতে নেই।

টঙে ফিরে এসে তিমুর ছেলেদের বলল কভাকিনের সঙ্গে তার কি কথা হয়েছে। তারা ঠিক করল পরের দিন গোটা দলটার কাছে লিখিতভাবে এক চরমপত্র পাঠাবে।

ছেলের দল চুপিসারে টঙ থেকে নেমে এল। তারপর কেউ বেড়ার ফুটো দিয়ে গলে, কেউবা স্রেফ বেড়া ডিঙিয়েই ছুটল যে যার বাড়ির দিকে। তিমুর জেনিয়ার কাছে এল।

'কী? বুঝতে পারলে তো ব্যাপারটা?' তিমুর বলল তাকে।

'নিশ্চয়ই,' উত্তর দিল সে, 'তবে পুরোটা নয়। আর একটু সোজা করে বল।'

'বেশ, তাহলে নীচে নেমে এস আমার সঙ্গে। তোমার দিদি তো এমনিতেই এখন বাড়ি নেই।'

মাটিতে নেমে আসার পর তিমুর মইটাকে ঠেলা দিয়ে উল্টে ফেলে দিল।

তখন অন্ধকার হয়ে আসছে। তবুও মুহূর্তের দ্বিধা না করে জেনিয়া তিমুরের পিছন পিছন চলল।

বুড়ি গয়লানীর বাড়ির সামনে এসে তারা দাঁড়াল। তিমুর চারিদিকে একবার তাকাল। দেখল আশেপাশে কেউ নেই। পকেট থেকে তেল রঙের একটা টিউব বার করে গেটের কাছে গেল। গেটে আঁকা লাল তারকার ওপরের বাঁ দিকের ডগাটা সত্যি সত্যি বানমাছের মতো বেঁকে ছিল।

একটানে সে রেখাটিকে সোজা করে ডগাটি সুন্দর ছুঁচলো করে দিল।

জেনিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'বলো তো কী ব্যাপার এ সব, সহজ করে বলো এর মানেটা কী?'

তিমুর টিউবটা পকেটে রেখে খানিকপাতা ছিঁড়ে রঙ-মাখা আঙুলটা মুছে নিল। তারপর জেনিয়ার মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, 'ঐ তারার মানে— এ বাড়ির লোক লাল ফৌজে যোগ দিয়েছে। এখন থেকে ঐ বাড়ি রইল আমাদের জিম্মায়। তোমার বাবা কি সেনাবাহিনীতে আছেন?'

গভীর আবেগ ও গর্বের সঙ্গে জেনিয়া উত্তর দিল, 'হ্যাঁ। তিনি কম্যান্ডার।'

'তার মানে তোমরাও আমাদের জিম্মায় রইলে।'

আর একটা কুটিরের গেটে এসে তারা থামল। এখানেও একটি রক্ত তারকা ছিল, কিন্তু তার চারপাশে কালো দাগ-কাটা।

তিমুর বলল, 'ওটা দেখছ? এ বাড়ি থেকে একজন লাল ফৌজে গিয়েছিলেন। কিন্তু আর তিনি ফিরবেন না। এটা লেফটেনাণ্ট পাভলভের বাগান-বাড়ি, কিছুদিন হল তিনি সীমান্তে মারা গেছেন। তাঁর স্ত্রী আর সেই ছোট্ট মেয়েটি এখানে থাকে। ভালোমানুষ গেঁইকা-টা এখনও বার করতেই পারল না মেয়েটা সারাক্ষণ কেন কান্নাকাটি করে। জেনিয়া, তুমি সুবিধে পেলে দেখ তো ওর কোন উপকার করতে পার কিনা।'

সে খুব সহজভাবে এই কথাগুলো বলে গেল। যদিও সন্ধ্যেটা বেশ গরম ছিল তবুও তা শুনতে শুনতে জেনিয়ার গা শিরশির করে উঠল।

মাথা নীচু করে সে চুপ করে রইল। তারপর একটা কিছু বলতে হবে বলেই সে জিজ্ঞাসা করল, 'গেইকা কি ভালোমানুষ?'

তিমুর উত্তর দিল, 'হ্যাঁ। ও নাবিকের ছেলে। বড়াইবীর কলোকলচিকভটাকে সে বকুনি দেয় বটে তবু সে সব সময় তার পক্ষ নিয়ে দাঁড়ায়।'

আচমকা একটা তীক্ষ্ম ক্রুদ্ধ চীৎকারে তারা দুজনে ঘুরে দাঁড়াল। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে ওলগা।

জেনিয়া তিমুরের হাত ধরল। সে চেয়েছিল ওলগার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবে।

কিন্তু আর একটি তীক্ষ্ম নিরুত্তাপ চীৎকার হতেই জেনিয়া তার সংকল্প ত্যাগ করল।

তিমুরের দিকে চেয়ে কেমন অপরাধীর মতো মাথা নাড়ল জেনিয়া এবং কিছুই বুঝতে না পেবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে এগিয়ে গেল ওলগার দিকে।

দম টানতে টানতে কাঁদো কাঁদো গলায় ওলগা বলল, 'জেনিয়া! আমি বারণ করে দিচ্ছি ওই ছেলেটার সঙ্গে কথা বলবি না। শুনলি?'

জেনিয়া বিড়বিড় করে বলল, 'কি বলছ ওলিয়া? কি হল তোমার?'

ওলগা দৃঢ়স্বরে আবার বলল, 'আমি বারণ করছি ওই ছেলেটার সঙ্গে মিশবি না। তোর বয়স তেরো আর আমার আঠারো। আমি তোর দিদি — তোর চেয়ে আমার বয়স বেশী। তাছাড়া যাবার সময় বাবা আমাকে বলে গিয়েছেন...'

'কিন্তু ওলিয়া, তুমি কিচ্ছু, একেবারে কিচ্ছু বুঝতে পারছ না!' হতাশায় জেনিয়া চেঁচিয়ে উঠল। সে তখন কাঁপছে। সবকিছু সে বোঝাতে চায়, জানাতে চায়, অন্যায় সে কিছু করে নি। কিন্তু তা পারল না। তার যে অধিকার নেই। সে শুধু হতাশভাবে হাতটা নাড়ল, দিদিকে আর একটা কথাও বলল না।

সোজা গিয়ে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল; কিন্তু অনেকক্ষণ তার ঘুম এল না। ঘুমিয়ে পড়ার পরে সে টেরও পেল না রাত্তিরে জানালায় টোকা দিয়ে কখন পিয়ন এসে তার বাবার একটা টেলিগ্রাম দিয়ে গেছে।

ভোর হতে রাখাল ফুঁ দিল শিঙায়। বুড়ি গয়লানী ফটক খুলে তার গরুটাকে নিয়ে চলল মাঠের পালের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেবার জন্যে। বুড়ি মোড়টা পেরোতে না পেরোতেই অ্যাকেসিয়ার ঝোপের আড়াল থেকে পাঁচটি ছেলে লাফিয়ে বেরিয়ে

এল। সাবধানে হাতের খালি বালতিগুলোতে এতটুকু ঝনঝন শব্দ না করে তারা ছুটে এল কুয়োর কাছে।

'পাম্প কর।'

'লাগা!'

'নে!'

'ধর।'

ঠাণ্ডা জলে পা ভিজিয়ে উঠোনময় দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াল ছেলের দল। সেখানে ওক কাঠের পিপেতে বালতিগুলো খালি করেই আবার তারা ছুটে ছুটে আসছিল কুয়োর ধারে।

অনবরত জল পাম্প করতে করতে সিমা সিমাকভ ভিজে গিয়েছিল। তার কাছে দৌড়ে এসে তিমুর বলল, 'কলোকলচিকভকে দেখেছিস কোথাও? দেখিস নি? তাহলে ওর ঘুম ভাঙ্গে নি। চটপট নে। শীগগির বুড়ি এসে হাজির হবে।'

তিমুর চুপিসারে কলোকলচিকভদের বাগানে ঢুকে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে শিস দিল। উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে গাছটায় চড়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখল। গাছটা থেকে শুধু দেখা গেল জানালার কাছে একটা বিছানার অর্ধেকটা আর তাতে কম্বলে ঢাকা একজোড়া পা।

গাছের একটুকরো ছাল বিছানায় ছুড়ে সে আস্তে আস্তে ডাকল, 'কলিয়া ওঠ! এই কলিয়া!'

নিদ্রিতের সাড়াশব্দ মিলল না। তখন তিমুর তার ছুরিটা বার করে একটা সরু ডাল কেটে তার ডগাটা ছুঁচলো করে জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে কম্বলটা গেঁথে মারল এক টান।

পাতলা কম্বলটা জানালার চৌকাঠ বেয়ে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে এল। ঠিক তক্ষুনি ঘর থেকে একটা হতভম্ব ভাঙা ভাঙা আওয়াজ শোনা গেল। রাতের পোশাক-পরা পাকাচুল এক ভদ্রলোক ঘুম-জড়ানো চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিছানা ছেড়ে হুড়মুড়িয়ে নামলেন। তারপর পালিয়ে যাওয়া কম্বলটা আঁকড়ে ধরে ছুটে এলেন জানালার কাছে।

গণ্যমান্য এই বুড়ো লোকটির মুখোমুখি পড়তেই তিমুর ঝুপ করে মাটিতে নেমে পড়ল।

ইতিমধ্যে বুড়ো লোকটি উদ্ধার করা কম্বলটা বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়াল থেকে দোনালা বন্দুকটা পেড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি চশমাটা পরে নিলেন। তারপর জানালা দিয়ে বন্দুকটা বের করে নলটা আকাশের দিকে তুলে চোখ বন্ধ করে ঘোড়া টিপলেন।

তিমুর এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে তার দৌড় থামল কেবল কুয়োর ধারে এসে। ভারি ভুল হয়ে গিয়েছিল বটে। ঘুমন্ত লোকটাকে সে কলিয়া মনে করেছিল আর বুড়ো লোকটিও স্বভাবতই তাকে ভেবেছিলেন চোর।

ঠিক সেই সময় তিমুর দেখতে পেল বুড়ি গয়লানী বাঁকে জলের বালতি নিয়ে গেট দিয়ে বেরচ্ছে। চট করে সে অ্যাকেসিয়ার ঝোপের আড়ালে গিয়ে দেখতে লাগল কি হয়। কুয়ো থেকে ফিরে বুড়ি বালতি উপরে তুলে পিপেয় জল ঢালতেই চমকে সরে এল, কেননা আগেই কানায় কানায় ভর্তি করা পিপে থেকে সশব্দে সে জল ছিটকে এসে পড়ল তার পায়ের কাছে।

হাউমাউ করে উঠে হতভম্বের মতো এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখল বুড়ি, পিপেটার চারপাশ ঘুরে দেখল। জলের ভেতর হাত ডুবিয়ে শুঁকেও দেখল। তারপর হন্তদন্ত হয়ে দাওয়ার কাছে এসে দেখলে দরজায় ঠিকমতো তালা দেওয়া আছে কিনা। অবশেষে কি করবে ঠিক না পেয়ে সে পড়শীর জানালায় টোকা দিতে লাগল।

তিমুর হাসতে হাসতে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়ি তাকে সব সারতে হবে। সূর্য ইতিমধ্যেই বেশ উঠে আসছে। কলিয়া কলোকলচিকভের পাত্তা নেই। অথচ এখনো তারগুলোর মেরামত বাকি।

•

বাগানের মধ্যে দিয়ে গোলাবাড়িতে যেতে যেতে তিমুর জেনিয়াদের বাড়ির একটা খোলা জানালার দিকে তাকাল।

হাফ-প্যাণ্ট আর পোলো সার্ট পরে জেনিয়া বিছানার কাছে টেবিলে বসে কী যেন লিখছে। অধৈর্য হয়ে সে খালি মুখের উপর এসে পড়া চুলগুলো পেছনে সরিয়ে দিচ্ছে।

তিমুরকে দেখে জেনিয়া ভয়ের, এমনকি বিস্ময়েরও কোন লক্ষণই দেখাল না। সে শুধু আঙুল নেড়ে জানাল ওলগাকে যেন না জাগায়। তারপর অসমাপ্ত চিঠিটা ড্রয়ারে রেখে পা টিপে সে ঘরের বাইরে চলে এল।

সকালে তিমুরের দুরদৃষ্টের কাহিনী শুনে সে ওলগার সব উপদেশ ভুলে গেল এবং নিজে যে তারগুলো ছিঁড়েছে তা মেরামতের কাজে তাকে সাহায্য করতে রাজি হল সানন্দেই।

কাজ শেষ করে তিমুর যখন বেড়ার অন্যদিকে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তখন জেনিয়া বলল, 'জানি না কেন দিদি তোমাকে মোটেই দেখতে পারে না।'

'যা বলেছ,' মর্মাহত হয়ে তিমুর বলল। 'আমার কাকাবাবুও তোমার সম্বন্ধে ঐ রকমই ভাবেন!'

সে যাবার উপক্রম করতেই জেনিয়া তাকে থামাল।

'দাঁড়াও। তোমার চুলটা আচড়ানো দরকার। আজ তোমার চুলের যা ছিরি।'

নিজের চিরুনিটা সে দিল তাকে।

ঠিক তক্ষুনি জানালা থেকে ওলগার রাগত চিৎকার শোনা গেল, 'জেনিয়া! কি হচ্ছে?..'

একটু পরেই দেখা গেল দুই বোন বারান্দায় পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'তোমার বন্ধু তো আমি ঠিক করে দিতে যাই না, দিদিকি?' মরিয়া হয়ে জেনিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনে বলল। 'কোন বন্ধুরা? কেন, সাদা স্যুট-পরা সব বন্ধুরা। তোমার দিদি কেমন চমৎকার বাজান! চমৎকারই বটে! বরং শুনলে পারতে কেমন চমৎকার বকতে পারে। দাঁড়াও না, সব কথা আমি বাবাকে লিখে জানাব।'

'জেনিয়া! ও ছেলেটা হল গুন্ডা আর তুই একটা গবেট!' সুস্থির থাকার চেষ্টা করে ঠান্ডা গলায় ভর্ৎসনা করল ওলগা। 'ইচ্ছে হয় বাবাকে লিখবি, কিন্তু আবার যদি ঐ ছেলেটার সঙ্গে তোকে দেখি তাহলে তক্ষুনি আমি এ জায়গা ছেড়ে যাব আর তোকেও নিয়ে যাব মস্কোয়। আর জানিস তো আমার কথার খেলাপ হয় না?'

'তা জানি, লোককে জ্বালিয়ে মারতে পার।' জল-ভরা চোখে উত্তর দিল জেনিয়া, 'খুব ভাল করেই তা জানি।'

ওলগা বলল, 'এবার পড় এটা।' গত রাত্রে যে টেলিগ্রামটা এসেছিল সেটা টেবিলের ওপর রেখে ওলগা বেরিয়ে গেল।

টেলিগ্রামে ছিল:

'দিন কয়েক বাদে পথে কয়েক ঘণ্টার জন্যে মস্কোয় থামব। তারিখ আর সময় পরে তার করে জানাব। বাবা।'

জেনিয়া চোখ মুছে টেলিগ্রামটা ঠোঁটের উপর ধরে বিড়বিড় করে বলল, 'বাবা! তুমি শীগ্‌গির এস! বাবা! আমার, তোমার আদরের জেনিয়ার যে কত কষ্ট যাচ্ছে!'

দুরন্ত খুকি নিউরকা ছাগল হারিয়ে ফেলেছিল বলে যে বুড়ি তাকে চড় মারে তার বাড়িতে দু গাড়ি জ্বালানী কাঠ এসেছিল।

ঠাকুমা বুড়ি হাঁসফাঁস করতে করতে অতি কষ্টে গোঙাতে গোঙাতে কাঠগুলো কুড়িয়ে জড় করছিল আর সেগুলো ওভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলার জন্যে গালমন্দ করছিল বেগরজী গাড়োয়ানদের। কিন্তু কাজটা তার সাধ্যের অতীত।

কাশতে কাশতে সে দম নেবার জন্যে বৈঠার ওপর বসে পড়ল। তারপর জলের ঝারিটা নিয়ে চলে গেল তার সব্জীর বাগানে। উঠোনে তখন রইল মাত্র নিউরকার তিন বছরের ছোট ভাইটি। বোঝাই যায় মাণবকটি খুবই উদ্যোগী ও পরিশ্রমী, কারণ ঠাকুমা চলে যেতেই সে একটা ছড়ি কুড়িয়ে বেঞ্চির ওপর আর ওল্টানো একটা টবের ওপর বাড়ি মারতে লেগে গেল।

সিমা সিমাকভ এতক্ষণ পালিয়ে যাওয়া ছাগলটার সন্ধান করছিল। দেখা গেল ঝোপঝাড় আর খানানালা পেরোতে ছাগলটা বেঙ্গল টাইগারের চেয়ে কম যায় না। সুতরাং সিমা সিমাকভ জঙ্গলের ধারে একজনকে দাঁড় করিয়ে রেখে দলবল নিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল উঠোনে। বাচ্চাটার মুখে একমুঠো বুনো স্ট্রবেরি পুরে দিয়ে সে একটা চকচকে কাকের পালক তার হাতে গুঁজে দিল। তার চার জনের দলটিও ততক্ষণে কাঠগুলো কুড়িয়ে লেগে গেল ঝটপট সাজিয়ে ফেলতে।

ইতিমধ্যে সিমা সিমাকভ দৌড়ল সব্জী ক্ষেতে ঠাকুমা বুড়িকে আটকে রাখতে। চেরি আর আপেলগাছের ঝাড়ের কাছে থেমে সে বেড়ার ফুটো দিয়ে উঁকি মারতে লাগল।

দেখতে পেল ঠাকুমা বুড়ি কোঁচড়ভর্তি শসা কুড়িয়ে নিয়ে উঠোনে ফেরবার উপক্রম করছে।

অমনি আস্তে আস্তে সে বেড়ার তক্তায় খট্‌খট্‌ শব্দ করল।

সচকিত হয়ে উঠল ঠাকুমা বুড়ি। সিমা তখন একটা লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে তাই দিয়ে আপেলগাছের ডাল নাড়তে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুমা বুড়ি ধরে নিল আপেল চুরি করবার জন্যে কে যেন চুপি চুপি বেড়া বেয়ে উঠছে। শসাগুলো আলের ওপর রেখে একটা বিছুটির ডাল ভেঙে নিয়ে বেড়ার কাছে গিয়ে সে বসে রইল গুঁড়ি মেরে।

সিমা সিমাকভ আবার সেই ফাটল দিয়ে তাকাল। কিন্তু এবার সে বুড়িকে দেখতে পেল না। অস্থির হয়ে সে তড়াক করে লাফিয়ে বেড়ার ওপরটা ধরে সাবধানে মাথাটা তুলতে লাগল।

ঠিক তক্ষুনি বুড়ি সোল্লাসে চীৎকার করে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সিমার দুই হাতে সপাং সপাং করে বাড়ি মারতে লাগল বিছুটি দিয়ে। জ্বলুনি-ধরা হাতদুটো নাড়তে নাড়তে সিমা পাগলের মতো ছুটে গেল গেটের দিকে। ততক্ষণে অন্য ছেলের দল তাদের কাজ শেষ করে সেখান দিয়ে দৌড়ে পালিয়েছে।

উঠোনে রয়েছে শুধু বাচ্চাটা। সে একটা কাঠের চিলতে তুলে এনে জড় করা কাঠগুলোর ধারে রাখল, তারপর একটুকরো বার্চের ছাল টেনে ছিঁড়তে লাগল।

সব্জী বাগান থেকে ফিরে এসে ঠাকুমা বুড়ি দেখে সে এই কাজে মহাব্যস্ত।

বিস্ফারিত চোখে সে তাকিয়ে রইল সুন্দর করে থাক দেওয়া সেই কাঠের স্তূপের দিকে।

বুড়ি জিজ্ঞাসা করল, 'আমি চলে যাওয়ার পর কে এ সব কাজ করেছে রে?'

বাচ্চাটি বার্চের ছালটা কাঠের স্তূপে রেখে দিয়ে ভারিক্কী চালে বলল, 'দেখতে পাচ্ছ না ঠাকুমা কে করেছে, আমি করেছি।'

ইতিমধ্যে বুড়ি গয়লানীও উঠোনে এসে হাজির। জল আর কাঠ নিয়ে যেসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে তাই নিয়ে তাদের মধ্যে সজীব জল্পনা শুরু হল। বাচ্চাটার পেট থেকে আসল কথা আদায়ের চেষ্টা করেও বিশেষ কোন ফল হল না। সে শুধু বলল যে কয়েকজন লোক ফটক দিয়ে এসে ঢোকে। মিষ্টি বুনো স্ট্রবেরী তার মুখে পুরে দেয় তারা আর একটা পালকও দেয়। আরও বলেছে যে দুটো কান আর চার পাওয়ালা একটা খরগোস তাকে ধরে দেবে। তারপর তারা কাঠগুলো ঠিক জায়গায় সাজিয়ে রেখে দৌড়ে পালিয়েছে।

নিউরকা উঠোনে এসে হাজির হল।

ঠাকুমা বুড়ি জিজ্ঞাসা করল, 'নিউরকা, তুই কি দেখেছিস আমাদের উঠোনে এইমাত্র কে এসেছিল?'

'না দেখি নি। আমি তো ছাগলটাকে খুঁজছিলাম।' কাঁদো কাঁদো গলায় নিউরকা উত্তর দিল। 'সারা সকালটাই তো ছাগলটার পেছনে চারদিকে ছোটাছুটি করে মরছি।'

গয়লানীর দিকে ফিরে ঠাকুমা বুড়ি সখেদে নালিশ করল, 'ছাগলটা চুরি গেছে গো! কি চমৎকার ছাগলটা ছিল! ছাগল তো নয়, একেবারে সোনামণি!'

ঠাকুমার কাছ থেকে সরে গিয়ে নিউরকা গজরে উঠল, 'সোনা বৈকি! একবার শিঙ নেড়ে ছুটতে শুরু করলে হল, পালিয়ে বাঁচাই দায়। সোনামণির অমন শিঙ থাকে না।'

'থামলি নিউরকা! চুপ কর অকর্মার ধাড়ি!' ঠাকুমা চেঁচিয়ে উঠল। 'তা সত্যি ছাগলটার একটু মেজাজ ছিল বৈকি। আমি তো ছাগলছানাটাকে বিক্রি করতেই চেয়েছিলাম। এখন কোথায় গেল আমার বাছা গো।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যাঁচ করে গেটটা খুলে গেল। মাটিতে শিঙ নামিয়ে ছাগলটা লাফিয়ে ভেতরে ঢুকেই সোজা ছুটে গেল গয়লানীর দিকে। বেচারী এক হ্যাঁচকায় ভারি দুধের বালতিটা টেনে তুলে চীৎকার করে একলাফে দাওয়ার ওপর উঠে পড়ল। ছাগলটাও বাড়ির দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল।

তখন প্রত্যেকের নজরে পড়ল, ছাগলটার শিঙে একটা বোর্ড আটকে দেওয়া হয়েছে। তার গায়ে বড়ো বড়ো করে লেখা:

আমি ছাগল শৃঙ্গবান
সবাই ভয়ে কম্পমান।
খুকিকে যে দেবে মার
দুঃখ আছে কপালে তার।

ইতিমধ্যে বেড়ার ওপাশে মোড়ে দাঁড়িয়ে একপাল ছেলে মনের আনন্দে হাসছিল।

সিমা সিমাকভ মাটিতে একটা লাঠি পুঁতে সেটাকে ঘিরে পা ঠুকে নাচতে নাচতে গলা ফাটিয়ে গাইতে লাগল:

ডাকু গুন্ডা নইক মোরা
নই দঙ্গল লক্ষ্মীছাড়া,
আমরা হাসিখুসির ছল
পাইওনিয়র কিশোর দল।
ও — হোই!

তারপরেই একঝাঁক দোয়েলের মতো নিঃশব্দে উধাও হয়ে গেল ছেলেরা।

আজকের দিনের অনেক কাজই এখনো বাকি। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কাজ হল চরমপত্র রচনা করে মিশ্‌কা ক্‌ভাকিনের কাছে পাঠান।

চরমপত্র কি করে লিখতে হয় তা কেউ জানে না, তিমুর তাই তার কাকাকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল।

কাকা বুঝিয়ে দিল যে বিভিন্ন দেশে চরমপত্র রচনার ভিন্ন ভিন্ন রীতি আছে। তবে ভদ্রতার খাতিরে সবাইকেই শেষ করতে হয় এই কথা দিয়ে:

'মন্ত্রিবর! অনুগ্রহপূর্বক আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন।'

তারপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত দূত মারফৎ শত্রুদেশের রাষ্ট্রপতির কাছে সে চরমপত্র পাঠান হয়।

এ ব্যবস্থা তিমুর কি অন্যান্য কোন ছেলেরই মনঃপূত হল না। প্রথমত, ঐ গুন্ডা ক্‌ভাকিনকে কোনরকম শ্রদ্ধা দেখাবার ইচ্ছা মোটেই তাদের ছিল না, দ্বিতীয়ত, ঐ দঙ্গলটার জন্যে কোন স্থায়ী রাষ্ট্র দূত বা দূতও ছিল না তাদের।

এ বিষয় নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করে তারা ঠিক করল আরও সহজ ধরনের

এক চরমপত্র পাঠাবে, অনেকটা সেই রকম, তুর্কীর সুলতানের কাছে জাপোরজিয়ের কসাকরা যেমন পাঠিয়েছিল। বীর কসাকরা কেমন করে তাতার, তুর্কী ও পোলীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল সে কাহিনীটা পড়বার সময় তারা সবাই সেই চরমপত্র পাঠানোর ছবিটা দেখেছে।

কাল দাগ দিয়ে ঘেরা লাল তারা-মার্কা ছাই রঙের গেটটার পেছনে, ওলগা আর জেনিয়া যে বাড়িতে থাকে তার ঠিক মুখোমুখি বাড়িটার ছায়াঘন বাগানে সোনালী-চুল একটি খুকি বালি-ঢাকা বীথি দিয়ে চলেছে। তার মা সুন্দরী তরুণী, তাঁর মুখে ক্লান্ত বিষণ্নতার ছাপ; মহিলাটি জানালার ধারে এক দোলনা চেয়ারে বসেছিলেন। জানালার ধারিতে দাঁড় করানো ছিল নানা রঙের জংলা ফুলের একটি ফলাও তোড়া। আত্মীয় কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত ও অপরিচিত সকলের কাছ থেকে পাওয়া চিঠি আর টেলিগ্রাম খোলা অবস্থায় স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে তাঁর সামনে।

চিঠি ও টেলিগ্রামগুলো গভীর সহানুভূতিতে ভরা — তারা যেন দূর থেকে তাঁর সঙ্গে কথা কইছে, বনের প্রতিধ্বনির মতো, যা পথিককে কোথাও যাবার জন্যে ডাকে না, কোনো প্রতিশ্রুতিও দেয় না, অথচ চাঙ্গা করে তুলে তাকে সান্ত্বনা দেয়, লোকজন আছে কাছেই অন্ধকার বনের মধ্যে সে নিঃসঙ্গ নয়।

সোনালী-চুল সেই মেয়েটি বেড়ার কাছে এসে থামল। পুতুলটাকে সে উল্টো করে ধরেছে — পুতুলের কাঠের হাতদুটো আর শণের বিনুনিগুলো লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। বেড়ার ওপর থেকে রঙচঙে একটা কাঠের খরগোস ঝুলছিল। একটা পা দিয়ে পটে আঁকা ছোট্ট একটা বালালাইকা বাজাল খরগোসটা; মুখটা তার কেমন কাঁদো কাঁদো অথচ মজাদার।

এই দুর্বোধ্য এবং অবশ্যই দুনিয়ায় অভূতপূর্ব এই ব্যাপার দেখে পুলকিত হয়ে পুতুল ফেলে খুকি দৌড়ল বেড়ার দিকে আর ওমা! সুন্দর খরগোসটাও টুপ করে এসে পড়ল তার হাতে। আর তারপর বেড়ার পেছন থেকে উঁচু হয়ে উঠল জেনিয়ার ধূর্ত-ধূর্ত জ্বলজ্বলে মুখখানা।

খুকিটি জেনিয়ার দিকে তাকাল। জিজ্ঞাসা করল, 'আমার সঙ্গে খেলা করছ তুমিই বুঝি?'

'আমিই। লাফিয়ে নেমে যাব তোর কাছে?'

একটু চিন্তা করে খুকি তাকে সাবধান করে বলল, 'এখানে কিন্তু বিছুটির ঝোপ আছে একটা। কাল আমার হাতে লেগে গিয়েছিল।'

জেনিয়া লাফিয়ে নেমে বলল, 'ও কিছু নয়, ওতে কোন ভয় নেই আমার। দেখাও তো কোন বিছুটিটা কাল তোমার হাতে লেগেছিল? এটা বুঝি? বেশ, এই দেখ, আমি এটাকে উপড়ে আনলাম। দ্যাখ পায়ে মাড়ালাম, থু-থুঃ! থুথুও ফেললাম। হয়েছে তো? এবার এস খেলি। তুমি খরগোসটা নাও, আমি নিই পুতুলটা।'

অলিন্দ থেকে ওলগা দেখতে পেল জেনিয়া পরের বাড়ির বেড়ার পাশে কিছু একটা করছে। কিন্তু সেদিনই সারা সকাল ধরে জেনিয়া এত কান্নাকাটি করেছে যে ওলগা আর ছোট বোনটিকে বাধা দিতে চাইল না। কিন্তু জেনিয়া বেড়া টপকে পরের বাগানে ঢুকতেই ওলগা অস্বস্তি বোধ করল। এগিয়ে এসে গেট খুলল সে। জেনিয়া আর খুকি এতক্ষণে জানালার ধারে মহিলাটির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়ের কাছে গোমড়ামুখো মজাদার খরগোসের বালালাইকা বাজানো দেখে তিনি হাসছিলেন।

জেনিয়ার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করে মহিলাটি বুঝতে পারলেন ওলগা অসন্তুষ্ট হয়েছে।

ওলগাকে নরম সুরে তিনি বললেন, 'ওর ওপর রাগ করবেন না। ও শুধু খুকির সঙ্গে খেলা করছে। আমাদের যে সর্বনাশ হয়েছে...' মহিলাটি চুপ করে গেলেন। 'আমি বসে বসে কাঁদি — আর ও,' মহিলাটি তাঁর কোলের মেয়েকে দেখিয়ে প্রায় চুপি চুপি বললেন, 'বেচারা জানেই না যে ওর বাবা কিছুদিন হল সীমান্তে নিহত হয়েছেন।'

এবার ওলগার বিব্রত হবার পালা। দূর থেকে জেনিয়া তার দিকে তাকাল ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে।

মহিলাটি বলে চললেন, 'আমি একেবারে একা। আমার মা থাকেন অনেক দূরে — পাহাড়ের দেশে, তাইগা অঞ্চলে। ভাইরা সবাই লাল ফৌজে — কোন বোনও নেই।'

জেনিয়ার কাঁধে হাত দিয়ে তিনি জানালার দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল রাত্রে তুমিই কি এই ফুলগুলো আমাদের দাওয়ায় রেখে গিয়েছিলে খুকি, তাই না?'

'না, না,' ঝট করে বলে বসল জেনিয়া, 'আমি, না। তবে নিশ্চয়ই আমাদেরই কেউ...'

বিমূঢ় দৃষ্টিতে ওলগা জিজ্ঞাসা করল, 'তার মানে?'

'আমি জানি না।' জেনিয়া ভয় পেয়ে গেল, 'মানে আমি না। আমি এ ব্যাপারের কিছুই জানি না। দেখ, কারা যেন আসছে।'

ফটকের ওপারে শোনা গেল গাড়ির শব্দ। বিমানবাহিনীর দুজন কম্যাণ্ডার গেট খুলে এগিয়ে এলেন।

মহিলা বললেন, 'ওঁরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। হয়ত আমায় আবার জিজ্ঞাসা করবেন ক্রিমিয়া, কি ককেশাসের কোন স্বাস্থ্যনিবাসে যেতে বলবেন...'

লোকদুটি টুপি ছুঁয়ে শুভেচ্ছা জানালেন। ওঁদের মধ্যে বয়স্কটি একজন ক্যাপ্টেন, সম্ভবত তাঁর শেষ কথাটুকু তিনি শুনেছিলেন, কারণ বললেন, 'না, এবার ক্রিমিয়া কি ককেশাসের কোন স্বাস্থ্যনিবাস নয়। আপনি তো মায়ের সঙ্গে দেখা করতে ছেয়েছিলেন, তাই না? বেশ, তিনি আসছেন আপনাকে দেখতে। আজই ট্রেনে রওনা হচ্ছেন ইরকুৎস্ক থেকে। বিশেষ বিমান করে তাঁকে ইরকুৎস্ক নিয়ে আসা হয়েছে।'

'কারা ব্যবস্থা করলেন?' আনন্দে বিচলিত হয়ে মহিলাটি বললেন, 'আপনারা?'

ক্যাপ্টেন উত্তর দিলেন, 'না, আমরাও করেছি, আপনাদের কমরেডরাও করেছেন।'

খুকিটি দৌড়ে এসে নির্ভয়ে আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে রইল। স্পষ্টই বোঝা গেল ঐ নীল উর্দির সঙ্গে সে বেশ পরিচিত।

সে বলল, 'মামণি, আমায় একটা দোলনা বানিয়ে দাও না। আমি তাতে দুলব সামনে-পেছনে, সামনে-পেছনে। দুলতে দুলতে উঠে যাব অনেক উঁচুতে বাবার মতো।'

'না রে না, দরকার নেই,' মা চেঁচিয়ে উঠলেন। ছোট মেয়েটিকে বুকে চেপে ধরলেন তিনি, 'না, না, বাবার মতো অত উঁচুতে নয়...'

মালায়া ওভ্‌রাজ্‌নায়া পাড়ায় যে ভজনালয়ের চটাওঠা প্রাচীরে কঠোরাকৃতি দাড়িওয়ালা বুড়ো বুড়ো লোক আর গোঁফদাড়ি কামানো দেবদূতের ছবি আঁকা রয়েছে তার পেছনে, এবং বড় বড় কড়াই, আলকাতরা আর বেগে ধাবমান শয়তানদের নিয়ে যেখানে 'শেষ বিচারের' ছবি আঁকা রয়েছে তার একটু ডানদিকে, ডেইজীফুলে ভরা সবুজ মাঠটায় মিশ্‌কা ক্‌ভাকিনের দল বসে বসে তাস খেলছিল।

তাদের কাছে পয়সাকড়ি ছিল না। তাই তারা হার জিতের হিসেব করছিল 'ঠোকন', 'গাঁট্টা' আর 'মরা বাঁচানি' মারফত। যে হারবে তার চোখ বেঁধে ঘাসের ওপর চিৎ করে ফেলে তার হাতে 'মোমবাতি', মানে একটা লম্বা লাঠি দিয়ে দেওয়া হবে। তখন তার দরদী বন্ধুরা মৃতের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বিছুটির ডাল দিয়ে তার খোলা হাঁটু, পায়ের গোছা কিংবা গোড়ালির দিকে যত রকমে পারে বাড়ি মেরে মেরে সেই মড়াকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করবে, আর তার কাজ হবে ঐ লাঠি দিয়ে তাদের ঠেকিয়ে রাখা।

খেলা যখন চরমে উঠেছে তখন বেড়ার ওধার থেকে একটা বিউগ্‌লের তীব্র আওয়াজ শোনা গেল। তিমুরের দূতরা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল।

বাহিনীর শিঙাবাদক কলিয়া কলোকলচিকভের হাতে ঝক্‌ঝকে পেতলের একটা বিউগ্‌ল্‌ আর বড় একটা খাম নিয়ে কঠোর মুখে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গেইকা। খামটা মোড়কের কাগজে তৈরী।

যাকে সকলে হোঁৎকা বলে ক্ষেপায় সে ছেলেটি বেড়ার ওপরে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এ আবার কি সার্কাস নাকি ফার্স রে বাবা!' ঘাড় বেঁকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'মিশ্‌কা, খেলা ছাড় রে! কী একটা মিছিল এসেছে তোর সঙ্গে দেখা করতে!'

বেড়ার ওপর উঠে ক্‌ভাকিন বলল, 'বটে, আরে গেইকা যে, খাসা! তা তোর সঙ্গে উচ্চিংড়েটা কে রে?'

'খামটা ধরো।' এই বলে গেইকা চরমপত্রটা দিয়ে দিল। 'ভাববার জন্যে তোমাদের চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেওয়া হল। কাল ঠিক এমন সময় উত্তরের জন্যে আসব।'

উচ্চিংড়ে বলায় ক্ষেপে গিয়ে কলিয়া কলোকলচিকভ বিউগ্‌ল্‌টা উঁচিয়ে দুই গাল ফুলিয়ে প্রচণ্ডভাবে বিরতির তূর্যনাদ করে উঠল। তারপর বেড়ার পাশে ছড়িয়ে যাওয়া ছেলেদের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে দিয়ে দুই পার্লামেণ্টারিয়ান কোনো কথা না বলে মর্যাদা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ছেলেদের বিস্ময় বিস্ফারিত মুখের দিকে তাকিয়ে খামখানা নাড়তে নাড়তে ক্‌ভাকিন বললে, 'ব্যাপার কি রে? দিব্যি ছিলাম বগল বাজিয়ে... হঠাৎ... একেবারে শিঙার বাদ্যি, বজ্রপাত! না, ভাই! আমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না!'

খামখানা ছিঁড়ে ফেলে বেড়ার ওপর বসে বসেই পড়তে আরম্ভ করল:

'পরের বাগানে হানাদারী দলের সর্দার মিখাইল ক্‌ভাকিনের প্রতি...' উচ্চৈস্বরে ব্যাখ্যা করে বলল সে। 'এ হল আমার উদ্দেশে লেখা, পুরোপুরি খেতাব সমেত, কেতাকায়দার কমতি নেই।' '...এবং তার কুখ্যাত সহকারী পিওতর পিয়াতাকভ ওরফে হোঁৎকার প্রতি...' হোঁৎকার দিকে তাকিয়ে সে সানন্দে জানাল, 'ওটা তোর উদ্দেশে। বেড়ে হয়েছে, একটা কথার মতো কথা: কুখ্যাত। তবে বেজায় ভদ্র, গবেটটাকে আরও সহজ একটা সম্বোধন করলেই পারত' '... এবং এই জঘন্য দলের অন্য সমস্ত সভ্যের প্রতি — **একটি চরমপত্র।**' 'সে আবার কি?' ঠাট্টার সুরে ঘোষণা করল ক্‌ভাকিন। 'কোন গালাগালি টালাগালি কিছু একটা হবে বোধ হয়।'

হোঁৎকার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল ন্যাড়ামাথা আলিওশ্‌কা, সে বুঝিয়ে দিল, 'ওটা একটা আন্তর্জাতিক শব্দ। মানে পিটুনি দেবে।'

ক্‌ভাকিন বলে উঠল, 'তা সেটা লিখলেই পারত! এবার আমরা প্রথম ধারাটা পড়ছি:

'যেহেতু, আমাদের সঙ্ঘের লাল তারকা চিহ্ন এমনকি শোকের প্রতীক কালো দাগ-দেওয়া লাল তারকা চিহ্নিত বাড়িও বাদ না দিয়ে শান্তিকামী অধিবাসীদের উদ্যানে তোমরা নৈশ অভিযান কর, সে জন্য হে কাপুরুষ নচ্ছারের দল, তোমাদের নির্দেশ দিতেছি...'

'দেখ একবার কুত্তারা গালিগালাজ দেয় কি রকম...' জোর করে হাসি টেনে পড়ে যেতে লাগল ক্‌ভাকিন। 'দেখ না কিরকম সব শব্দ আর কত কমার বহর এরপরে আসছে! শোন!'

'...কল্য প্রত্যুষের পূর্বেই তুমি, মিখাইল ক্‌ভাকিন এবং ঐ বজ্জাত পাজি হোৎকা — তোমাদের কুখ্যাত দলের সকলের নামের তালিকা লইয়া আমাদের বার্তাবহের প্রদর্শিত স্থানে উপস্থিত হইবে।

'তোমাদের অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে যে কোন কর্মপন্থা গ্রহণের অবাধ স্বাধীনতা আমাদের উপর বর্তাইবে।'

'স্বাধীনতা মানে কি বলতে চায় ওরা?' ক্‌ভাকিন ফের বলল, 'আমরা তো মনে হয় তাদের কোথাও তালাবন্ধ করে রাখি নি।'

'ওটা একটা আন্তর্জাতিক শব্দমাত্র। পিটুনি দেবে।' সেই ন্যাকড়ামাথা আলিওশকা আবার ব্যাখ্যা করে দিল।

বিরক্তিভরে ক্‌ভাকিন বলল, 'ওরা তাহলে সে কথা বলে না কেন? বড্ড বিচ্ছিরি হল — গেইকাটা চলে গেল, দেখছি কাঁদার সাধ হয়েছে তার।'

আলিওশকা বলল, 'ও কাঁদবে না। ওর ভাই হল জাহাজী।'

'তাতে কি?'

'ওর বাবাও ছিলেন জাহাজী। ও কাঁদবে না।'

'তাতে তোর কি রে?'

'আমার কাকাও যে জাহাজী।'

'হাঁদা কোথাকার, খুব একটা শোনালেন!' জ্বলে উঠল ক্‌ভাকিন। 'যত সব বাবা, দাদা, আর কাকা। কাজের কথা বল, চটপট মাথার চুলগুলো বরং গজিয়ে নে, রোদ্দুরে তোর ঘিলু সব শুকিয়ে গেছে।' তারপর হোৎকার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই অমন মিউমিউ করছিস কি জন্যে?'

হোৎকা রাগতভাবে সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'কাল ঐ বার্তাবাহকদের পাকড়াও করে, তিমুর আর তার চেলাচামুণ্ডাদের কষে প্যাঁদানি দিতে হবে।' চরমপত্র দেখে বিষম রেগে গিয়েছিল ও।

তখনকার মতো ব্যাপারটা এই পর্যন্তই রইল।

ভজনালয়ের ছায়ায় সরে এল ক্‌ভাকিন। যে ছবিটায় একদল তাগড়াই পালোয়ান শয়তান আর্তনাদকারী অনিচ্ছুক পাপীদের হিড়হিড় করে টানতে টানতে নরককুণ্ডে নিয়ে চলেছে, তার কাছে থেমে সে হোঁৎকাকে বলল, 'আচ্ছা, বাপ-মরা মেয়েটা যেখানে থাকে সে বাগানে কি তুই ঢুকেছিলি?'

'গিয়েছিলাম। তাতে হয়েছে কি?'

'বাস, হবে ঠিক এই রকমটি...' প্রাচীরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বিষণ্ণভাবে বলতে লাগল ক্‌ভাকিন, 'তিমুরের চিহ্ন অবশ্য আমি থোড়াই পরোয়া করি, ইচ্ছে করলে যে কোন দিনই ওকে শায়েস্তা করে দিতে পারি।'

হোঁৎকা তা মেনে নিয়ে বলল, 'বেশ তো। তাই বলে শয়তানগুলোর দিকে আঙুল দেখাচ্ছিস কেন?'

বিদ্রূপের হাসি হেসে ক্‌ভাকিন উত্তর দিল, 'কারণ, তুই আমার দোস্ত হলে কি হবে, তুই একেবারেই মানুষের মতো নস, বরং অবিকল এই হোঁদল কুৎকুৎ হতকুচ্ছিত ধেড়ে শয়তানটার মতো।'

ভোরবেলা উঠে গয়লানী তার তিনজন বাঁধা খদ্দেরকে বাড়িতে পেল না। বাজারে যাবার পক্ষে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল তখন, তাই দুধের পাত্রটা কাঁধে তুলে নিয়ে সে বাড়ি বাড়ি ঘুরে দুধ ফেরি করতে লাগল। অনেক ঘুরে ঘুরেও কিছু লাভ হল না। অবশেষে সে এল তিমুরের বাড়িতে।

শুনতে পেল উঠোনে চমৎকার ভারি গলায় কে যেন গান গাইছে। বুঝল, বাড়ির লোকজন বাড়িতেই আছে এবং হয়ত এখানে তার কপাল খুলতেও পারে।

গেট দিয়ে ঢুকে সুরেলা গলায় বুড়ি হাঁকল, 'দুধ! দুধ নেবে গো?'

মোটা গলায় উত্তর হল, 'দু মগ!'

দুধের পাত্র মাটিতে নামিয়ে গয়লানী ফিরে দাঁড়িয়ে দেখে ঝোপের আড়াল থেকে ময়লা শতচ্ছিন্ন পোশাকে দাড়ি গোঁপওয়ালা খোঁড়া একটা বুড়ো নাঙ্গা বাঁকা একখানা তলোয়ার হাতে বেরিয়ে আসছে।

ভয় পেয়ে সরে গিয়ে গয়লানী জিজ্ঞাসা করল, 'বলছিলাম দুধ নেবে গো? না বাপু তোমার চেহারাটা তেমন ভালো ঠেকছে না। কি ব্যাপার গো? ঐ তলোয়ারটা কেন, ঘাস কাটার জন্যে?'

'দুই মগ। টেবিলে পাত্র আছে,' তলোয়ারের ডগা মাটিতে পুঁতে বুড়ো সংক্ষেপে জবাব দিল।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে ভাঁড়ে দুধ ঢালতে ঢালতে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বুড়োর দিকে তাকিয়ে গয়লানী বলে চলল, 'তা বাপু, একটা কাস্তে কিনলেই হয়, তলোয়ারটা ফেলে দেওয়াই ভালো। ওই রকম তলোয়ার দেখলে নিরীহ মানুষ তো ভয়েই মরবে।'

ঢিলা পাজামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, 'কত?'

'যা আর সবাই দেয়, তাই।' গয়লানী উত্তর দিল। 'এক মগের দাম এক রুব্‌ল্‌ চল্লিশ, একুনে দুই রুব্‌ল্‌ আশি। আমি বেশী দাম নিই না।'

মস্ত পকেট হাতড়ে বড় গোছের তোবড়ানো একটা রিভলভার বের করে আনল বুড়ো।

'তা আমি নয় বাপু পরেই আসব...' বিড়বিড় করে বলেই বুড়ি পাত্রটা টেনে তুলে চম্পট দেবার যোগাড় করল। 'ওর জন্যে কষ্ট করতে হবে না!' বুড়ি ততক্ষণে প্রায় দৌড়তে শুরু করেছে, ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে আর বলে চলেছে, 'টাকার আমার বাবাজী অত তাড়া নেই।'

চটপট ফটক থেকে বের হয়েই বুড়ি ধড়াস করে তা বন্ধ করে দিল এবং গলিতে পড়েই রেগেমেগে চেঁচাতে শুরু করল, 'বুড়ো শয়তান কোথাকার! পাগলা গারদে তোকে পুরে রাখা উচিত, এমন লোককে ছেড়ে রাখে কেউ! হ্যাঁ গা, তালাচাবি দিয়ে পাগলা গারদ।'

বুড়োটা কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে তিন রুব্‌লের নোটটা ফের পকেটে গুঁজে রাখল এবং প্রৌঢ় ভদ্রলোক ডাঃ ফ. গ. কলোকলচিকভকে আসতে দেখেই চোখের নিমেষে রিভলভারটা পেছন দিকে লুকিয়ে ফেলল।

ডাক্তারবাবু লাঠিতে ভর দিয়ে একান্ত গম্ভীরভাবে বালি-ঢালা পথ দিয়ে কেঠো পায়ে হেঁটে আসছিলেন।

অদ্ভুত বুড়োটাকে নজরে পড়তেই তিনি একটু কেশে চশমাটা ঠিক করে নিলেন।

প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, এই বাড়ির মালিকের কোথায় দেখা পাব বলতে পারো হে?'

বৃদ্ধ উত্তর দিল, 'এ বাড়িতে আমিই থাকি।'

বয়স্ক ভদ্রলোকটি তাঁর স্ট্রহ্যাটটা একটু তুলে বললেন, 'তাহলে বলুন তো, তিমুর গারায়েভ বলে আপনার কোন আত্মীয় আছে কি?'

'আছে। ছেলেটি আমারই ভাইপো।'

গলাটা ঝেড়ে নিয়ে মাটিতে বেঁধানো তরোয়ালের দিকে একটু বিহ্বল কটাক্ষপাত করে প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন, 'আপনাকে এ সব কথা বলতে দুঃখ বোধ করছি। কিন্তু কাল সকালে আপনার ভাইপো আমাদের বাড়িতে চুরি করার চেষ্টা করেছিল।'

'কি বললেন? আমাদের তিমুর আপনার বাড়িতে চুরির চেষ্টা করেছিল?'

'হ্যাঁ, একবার ভেবে দেখুন!' বলতে বলতে বয়স্ক ভদ্রলোকের নজর পড়ল বুড়োর পেছন দিকটায়। একটু একটু করে ঘাবড়াতে আরম্ভ করেছিলেন তিনি। 'ঘুমুচ্ছিলাম, সেই সময় আমার গায়ে যে ফ্লানেলের কম্বলটা ঢাকা ছিল সেইটে চুরির চেষ্টা করছিল সে।'

'কে? তিমুর চুরি করছিল? আপনার ফ্লানেলের কম্বল চুরি করছিল?' বুড়ো লোকটা হতভম্ব হয়ে পড়ল। রিভলভার ধরা হাতটা অজান্তে পিঠের দিক থেকে সরে এল পাশে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক স্পষ্টতই এবার ভয় পেয়ে গেলেন। যথাসম্ভব গাম্ভীর্যের সঙ্গে গেটের দিকে পেীছিয়ে এসে তিনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'অবশ্য হলপ করে আমি বলতে পারব না, কিন্তু তবুও ঘটনা ঘটনাই! দোহাই মশাই, দয়া করে আমার কাছে আসবেন না। আমি অবশ্য ঠিক বুঝতে পারছি না, কেন... কিন্তু আপনার চেহারা, — আপনার অদ্ভুত ব্যবহার...'

'শুনুন মশাই!' ডাক্তারবাবুর দিকে এগিয়ে এসে বুড়ো লোকটা বলল, 'নিশ্চয়ই কোন ভুল করেছেন।'

রিভলভারটির দিক থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়েই পেছতে পেছতে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বলে চললেন, 'সত্যিই মশাই, আমাদের যা বয়স তাতে আলোচনাটি একান্ত অমর্যাদার স্তরে এসে পেঁছচ্ছে, অবাঞ্ছনীয় স্তরেই বলা যেতে পারে।'

গলিতে ছুটে বেরিয়েই তিনি এই বলতে বলতে তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন, 'না না, অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় ও অমর্যাদার স্তরে নেমে আসছে...'

বুড়োটা যখন গেটে এসে পেঁছেছে, ঠিক সেই সময় নদীতে সাঁতার দিতে যাবার পথে ওলগা একেবারে সেই উত্তেজিত ভদ্রলোকের সামনাসামনি এসে পড়ল।

বুড়োটা হাত নেড়ে ওলগাকে থামতে বলল। ডাক্তারবাবু কিন্তু ছাগলের মতো তড়বড়িয়ে নালাটা পেরিয়েই ওলগার হাত ধরে চোখের নিমেষে মোড়টা ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হাসিতে ফেটে পড়ল বুড়োটা। বেশ খোশ মেজাজে ফুর্তি করে কাঠের পায়ে তাল দিতে দিতে গান ধরল:

> দ্রুতগতি বিমানেতে তুমি
> বুঝবে না যে নিচে রয়েছে
> আর কে রয়েছে সারা রাত
> তোমার, তোমার পথ চেয়ে।
> এহে!

তারপর সে হাঁটুর ফিতের বাঁধন খুলে কাঠের পাটা ঘাসের ওপর ছুঁড়ে ফেলে পরচুলা আর দাড়িটা খসাতে খসাতেই দৌড়তে লাগল বাড়ির দিকে।

মিনিট দশেক পরে হাসিখুসি তরুণ ইঞ্জিনিয়ার গেওর্গি গারায়েভ দাওয়ার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গ্যারেজ থেকে মোটর সাইকেলটা বের করে আনল। তারপর কুকুর রিতাকে বাড়িটা পাহারা দিতে বলে স্টার্টার টিপেই সিটে লাফিয়ে উঠে ছুটল নদীর দিকে ওলগার সন্ধানে যাকে সে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

সকাল ১১টায় গেইকা আর কলিয়া কলোকলচিকভ চরমপত্রের উত্তরের জন্য বেরিয়ে পড়ল।

'সমান তালে চল,' গেইকা খেঁকিয়ে উঠল কলিয়াকে। 'হাল্কা শক্ত কদমে পা ফেলবি। আর তুই এমন ভাবে চলিস যে মনে হয় যেন মুরগীর বাচ্চা লাফিয়ে পোকা ধরে বেড়াচ্ছে। সাজগোজ তো চমৎকার হয়েছে — প্যাণ্ট, সার্ট সবকিছুই তো আছে — তবু ঠিক জাঁকটা ফুটছে না। রাগ করিস না তা বলে, যা বলছি তোর ভালর জন্যেই বলছি। এই দ্যাখ্ যাচ্ছিস আর যেতে যেতে ঠোঁট চাটছিস, কেন বল ত? মুখের ভেতরে জিভটাকে পুরে রাখ, জায়গা মতো থাক জিভটা... আরে, তুই এখানে কি করছিস?' সিমা সিমাকভকে আড়াআড়ি ছুটে আসতে দেখে গেইকা বলল।

সিমাকভ তড়বড়িয়ে বলে গেল, 'তিমুর আমাকে যোগাযোগের কাজে পাঠিয়েছে। দরকার আছে রে, দরকার আছে, কিছু বুঝিস না তোরা। তোদের কাজটা তোদের, আমার কাজটা আমার। কলিয়া তোর বিউগ্‌ল্‌টা বাজাতে দিবি — মাত্র একবার? ওহ, আজ তোর দেখছি ভারি জমকালো চেহারা! আর গেইকা, এই গবেটটা, এমন একটা ব্যাপারে বেরোবার সময় একজোড়া বুট কি জুতো পরিস নি কেন? দূত কি কখনো খালি পায়ে হাঁটে? আচ্ছা চলি, তোরা ওদিক দিয়ে যা, আমি এদিক দিয়ে যাই। আবার দেখা হবে!'

'কি বাজে বকতে পারে!' মাথা নেড়ে গেইকা বলল। 'যেখানে চারটে কথায় কাজ হয় সেখানে ওর একশো'টা কথা বলা চাই। এই কলিয়া, এবার বিউগ্‌ল্‌ বাজা। এই তো বেড়াটা।'

বেড়ার উপরে যার মাথাটা দেখা গেল সেই ছেলেটাকে উদ্দেশ করে গেইকা হুকুম করলে, 'মিখাইল ক্ভাকিনকে ওপরে উঠতে বলো!'

ওপার থেকে ক্ভাকিন ডাকল, 'ডানদিকে যাও! তোমাদের জন্যে ওখানকার গেটটা খোলাই আছে দেখবে।'

গেইকার হাতে টান দিয়ে কলিয়া ফিসফিসিয়ে বলল, 'গিয়ে কাজ নেই। ওরা আমাদের ধরে কষে মার লাগাবে।'

গেইকা ঘৃণাভরে জবাব দিল, 'মানে দুজনের বিরুদ্ধে ওরা সবাই? কলিয়া জোরে বিউগ্‌ল্‌টা বাজা। আমাদের দলেরও রাস্তা আছে সবখানে।'

মরচে-ধরা গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকেই এক দঙ্গল ছেলের সামনাসামনি গিয়ে পড়ল। সামনে তাদের ক্‌ভাকিন আর হোঁৎকা।

গেইকা দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করল, 'আমাদের চিঠির উত্তর দাও।'

ক্‌ভাকিন হাসল। হোঁৎকা ভ্রূকুটি করল।

ক্‌ভাকিন প্রস্তাব করল, 'দাঁড়াও না, কথাবার্তা হোক। একটু বসোই না, এত তাড়া কিসের?'

গেইকা নির্লিপ্ত কণ্ঠে দাবি করল, 'আমাদের চিঠির জবাব দাও। কথা পরে হতে পারে।'

সত্যিই আশ্চর্য, বুদ্ধির অগম্য। বাচ্চা, ফ্যাকাশে-মারা ছোট বিউগ্‌ল্‌বাদকটার পাশে দাঁড়িয়ে, জাহাজীদের জার্সী-পরা গাঁট্টাগোঁট্টা ছেলেটি কি অভিনয় করছে, ঠাট্টা করছে? নাকি এই নগ্নপদ চওড়া-কাঁধ ছেলেটি তার ধূসর চোখের তীব্র দৃষ্টি বিদ্ধ করে সত্যি সত্যি জবাব চাইছে, যেন তার জানাই আছে যে ন্যায় ও শক্তি তারই পক্ষে।

একটা চিরকুট তার হাতে দিয়ে ক্‌ভাকিন বলল, 'এই নাও।'

গেইকা কাগজটার ভাঁজ খুলল। তাতে অপটু হাতে আঁকা আছে মুঠোর মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছবি, নীচে একটা মুখখিস্তি।

ধীরস্থিরভাবে গেইকা কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে দিল। তার মুখের একটি পেশীও নড়ল না। আর সেই মুহূর্তেই জাপটে ধরা হল ছেলেদুটিকে।

তারা কোন বাধা দিল না।

গেইকার কাছে এগিয়ে এসে ক্‌ভাকিন বলল, 'ওই ধরনের চরমপত্রের জবাবে তোদের ছাতু করে দেওয়াই দরকার। তবে... লোক আমরা ভালো। তাই তোদের এখানে রাত্তির পর্যন্ত তালাবন্ধ করে রাখব,' এই বলে ভজনালয়টা দেখাল, 'আর রাত্তিরে আমরা চব্বিশ নম্বরের বাগানটা একেবারে সাফ করে ফেলব।'

অচঞ্চল স্বরে গেইকা জবাব দিল, 'সেটি হচ্ছে না।'

'আলবৎ করব!' চেঁচিয়ে উঠে হোঁৎকাটা এক ঘা কষে বসিয়ে দিল গেইকার মুখে।

'একশো বার তোরা আমায় মারতে পারিস।' একবার চোখ ঘোঁচ করে ফের

দু চোখ মেলে বলল গেইকা। উৎসাহ দিল কলিয়াকে, 'কলিয়া, ভয় পাস নে। বুঝতে পারছি আজ এক নম্বর সাধারণ জমায়েতের ডাক পড়বে।'

বন্ধ লোহার খড়খড়ি লাগানো ছোট ভজনালয়ের ভেতরে বন্দীদের ঠেলে দেওয়া হল। তালা এ'টে কাঠের খিল দিয়ে শক্ত করে আটকান হল দুটো দরজাই।

মুখের কাছে হাত রেখে হোঁৎকা দরজার সামনে এসে চীৎকার করে বলল, 'কিরে, এবার কাদের জিত, তোদের না আমাদের?'

ভেতর থেকে চাপা, প্রায় শোনা যায় না, উত্তর এল, 'না রে, হতচ্ছাড়ারা, এবার তোদের জিত আর কখনো হতে হবে না।'

হোঁৎকা বিরক্ত হয়ে থুথু ফেলল।

ন্যাড়া মাথা আলিওশকা গোমড়া মুখে বলল, 'ওর দাদা যে জাহাজী, সে আর আমার কাকা একই জাহাজে কাজ করে।'

হুমকি দিয়ে বললে হোঁৎকা, 'নয় জাহাজীই হল, তাতে হয়েছেটা কি? তুই কি ওদের ক্যাপ্টেন নাকি?'

'ওর হাত বাঁধা, আর তুই গিয়ে মারলি? ভালো হল এটা?'

'তুইও তবে এক ঘা খা!' হোঁৎকা দাঁত খি'চিয়ে আলিওশকার মুখে ঘুষি মারল।

অমনি ঘাসের উপরে দুজনে জড়াজড়ি গড়াতে লাগল। আর সকলে তাদের হাত ধরে পা ধরে টেনে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল...

কারুরই নজরে পড়ল না বেড়ার ওপরে লাইমগাছের ঘন পাতার আড়ালে সিমা সিমাকভের মুখটা দেখা যাচ্ছে।

সুড়ুৎ করে মাটিতে নেমেই অন্য লোকেদের সব্জী ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে সিমা ছুটল নদীর দিকে। সেখানে ছিল তিমুর আর অন্য ছেলের দল।

মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে তীরভূমির গরম বালুর ওপর শুয়ে শুয়ে ওলগা বই পড়ছিল।

জেনিয়া স্নান করছিল। হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরল তাকে।

জেনিয়া ফিরে দাঁড়াল।

কালো-চোখ লম্বা মতো একজন মেয়ে বলল, 'শোন, তিমুর আমাকে পাঠিয়েছে। আমার নাম তানিয়া। আমিও ওর দলের। ওর জন্যে তুমি তোমার দিদির কাছে বকুনি খেয়েছ বলে তার খুব দুঃখ হয়েছে। তোমার দিদি খুব রাগী তাই না?'

লাল হয়ে উঠে জেনিয়া বিড়বিড় করে বলল, 'তাকে দুঃখ করতে বারণ কর। ওলগা মোটেই রাগী নয়। তবে ঐ রকমই তার স্বভাব।' হতাশ ভঙ্গিতে হাতদুটো মুঠো করে সে বলল, 'উঃ দিদি! আমার দিদিটা! দাঁড়াও না বাবা আগে বাড়ি আসুন...'

বালির চরের একটু বাঁয়ে একটা খাড়া পাড় বেয়ে দুজনে উঠতে লাগল। এইখানে তাদের দেখা হল নিউরকার সঙ্গে।

দাঁত চেপে চেপে হড়বড় করে যেমন তার কথা বলার অভ্যাস তেমনি ঢঙেই সে জেনিয়াকে জিজ্ঞাসা করল, 'চিনতে পার? চিনেছ। আমি তোমায় দেখেই চিনেছি। ঐ যে তিমুর।' সে পোশাকটা ছেড়ে উল্টোদিকের যে পাড়টা ছেলের দলে ছেয়ে গিয়েছিল, সে দিকটা দেখাল। 'আমি জানি কারা আমার ছাগল খুঁজে দিয়েছে, কাঠ জড় করে দিয়েছে আর আমার ভাইটিকে স্ট্রবেরী খেতে দিয়েছে। তোমাকেও আমি চিনি,' বলেই সে তানিয়ার দিকে ফিরল। 'তোমাকে একদিন সব্জীবাগানে বসে বসে কাঁদতে দেখেছিলাম। কাঁদবে কেন? কেঁদে কি হবে? এই, চুপ করে থাকবি! এই পাজিটা! তা না হলে তোকে জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেব!' সে ছাগলটাকে ধমকে উঠল — একটা ঝাড়ের গোড়ায় সেটা বাঁধা ছিল। 'এস না ভাই — জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি!'

জেনিয়া আর তানিয়া দৃষ্টি বিনিময় করল। বেদেনীর মতো দেখতে রোদে পোড়া এ খুকিটা তো বেশ মজার।

হাত ধরাধরি করে তারা খাড়া পাড়ের কানায় এসে দাঁড়াল। ঠিক নীচেই স্বচ্ছ জলের নীল ছলছল স্রোত।

'নাও, ঝাঁপাও!'

'ঝাঁপাও!'

ঝপাৎ করে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই।

তারা জল থেকে মাথা তুলতে না তুলতেই চতুর্থ কে যেন ঝুপ করে পড়ল তাদের পেছনে।

ছেলেটি সিমা সিমাকভ। যেমন পোশাক পরেছিল তেমনি জুতো, গেঞ্জি আর হাফ প্যাণ্ট সমেত সে দৌড়ের মুখে গোত্তা দিয়ে জলে ডুব দিয়েছে। এক ঝাঁকিতে ভেজা চুলগুলো সরিয়ে সে ঘোঁৎঘোঁৎ করতে করতে জল ছিটিয়ে লম্বা হাতে জল কেটে কেটে অন্য পারের দিকে সাঁতারে চলল।

ঘাড় ফিরিয়ে সে চীৎকার করে বলল, 'বিপদ হয়েছে জেনিয়া, বিপদ! কলিয়া আর গেইকাকে ওরা আটকে রেখেছে!'

...বই পড়তে পড়তেই ওলগা পাড় বেয়ে উঠতে লাগল। চড়াইয়ের হাঁটা পথটা যেখানে বড় রাস্তায় পড়েছে সেখানে তার দেখা হল গেওর্গির সঙ্গে। সে তার মোটর সাইকেলের পাশে দাঁড়িয়েছিল। পরস্পরকে নমস্কার করল তারা।

'সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম আপনি আসছেন। ভাবলাম — যদি একই দিকে যান তাহলে আপনাকে তুলে নেব সঙ্গে।'

ওলগার বিশ্বাস হল না। বললে, 'উঁহুঁ, আপনি ইচ্ছে করেই আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।'

গেওর্গি বলল, 'তা সত্যিই বলেছেন। মিথ্যে করে বলব ভেবেছিলাম, খাটল না। শুধু সকালে আপনাকে ভয় দেখানর জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি। আমিই হলাম গেটের পাশের সেই খোঁড়া লোকটা, বুঝলেন? আমি রিহার্সালের সাজ করেছিলাম। উপরে উঠে আসুন। আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।'

ওলগা নেতিবাচক ঘাড় নাড়ল।

ওর বইয়ের ওপর একটা ফুলের তোড়া রাখল গেওর্গি। তোড়াটা ছিল চমৎকার। ওলগা ঘাবড়ে লজ্জায় লাল হয়ে গেল... এবং মাটিতে ফেলে দিল তোড়াটা।

গেওর্গি এতটা ভাবতে পারে নি।

ক্ষুণ্ণ হয়ে সে বলল, 'দেখুন! আপনি যেমন সুন্দর বাজান তেমনি সুন্দর গাইতেও পারেন, চোখদুটোও আপনার সরল, সুন্দর। আপনাকে তো আমি কিছু অপমান করি নি। কিন্তু আমার মনে হয় যে, আপনি যা ব্যবহার করলেন সেটা একেবারে ঘোরতর কংক্রীট কর্মীও করবে না।'

কৃতকার্যের জন্যে নিজেই ভয় পেয়ে অপরাধীর মতো ওলগা বলে বসল, 'আমার কোন ফুলের দরকার নেই! আমি... এমনি... মানে ফুল না নিয়েও আপনার সঙ্গে যাব।'

সে এগিয়ে এসে চামড়ার গদিতে বসতেই মোটর সাইকেলটা ছুটে চলল।

রাস্তাটা যেখানে দুভাগ হয়ে গেছে বসতির দিকের রাস্তাটা ছেড়ে খোলা মাঠের পথ ধরে ছুটল সাইকেলটা।

ওলগা চেঁচিয়ে উঠল, 'ভুল রাস্তায় চলেছেন। আমাদের যাবার কথা যে ডানদিকে!'

গেওর্গি উত্তর দিল, 'এটা আরও ভাল রাস্তা। এদিকটায় আরও ফুর্তি লাগবে।'

আর একটা বাঁক ঘুরতেই শনশন শব্দে মুখর একটা ছায়াঘন তরুকুঞ্জের ভেতর দিয়ে সাইকেলটা ছুটল। একটা কুকুর দল ছেড়ে এসে ঘেউঘেউ করতে করতে সাইকেলের পিছু নিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা তার! মোটর সাইকেল ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে। তারপর বিরাট কামানের গোলার মতো গোঁ-গোঁ করতে করতে

একটি লরি সামনের দিক থেকে এসে পড়ল। ধ্লোর মেঘ ভেদ করে বাইরে বেরোতেই দেখা গেল পাহাড়ের নীচে কোন এক অচেনা শহরের বড় বড় চোঙ, ধোঁয়া, মিনার, কাঁচ আর লোহা লক্কড়।

গেওর্গি চেঁচিয়ে বলল, 'ওই আমাদের কারখানা! বছর তিনেক আগে এইখানটাতে আমি কত ব্নো স্ট্রবেরী আর ব্যাঙের ছাতা তুলেছি।'

তখনও প্রায় প্রোদমে চলতে চলতেই সাইকেল জোরে একটা বাঁক ঘ্রল। ওলগা চেঁচিয়ে উঠল, 'এবার সোজা চল্ন! সোজা একেবারে বাড়ির দিকে।' হঠাৎ মোটরটা ঝিমিয়ে পড়ে আস্তে আস্তে থেমে গেল।

মাটিতে লাফিয়ে নেমে গেওর্গি বলল, 'এক মিনিট — সামান্য একটু বিগড়িয়েছে।'

মোটর সাইকেলটাকে উল্‌টিয়ে টেনে রাস্তার পাশের বার্চগাছের তলে ঘাসের ওপর শ্ইয়ে যে ব্যাগ থেকে কিছ্ যন্ত্রপাতি বের করে মেরামত করতে লেগে গেল।

ঘাসের উপর বসে ওলগা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'অপেরায় আপনার কিসের পার্ট? এত গম্ভীর আর ভয়ংকর কেন আপনার সাজ?'

'আমি নামছি এক পঙ্গ্ ব্ড়োর ভূমিকায়,' কাজ চালাতে চালাতেই জবাব দিল গেওর্গি। 'সে ছিল গেরিলা দলে। একটু মাথা পাগলা। সীমান্তের কাছেই থাকে সে আর তার কেবলি ধারণা শত্রুরা আমাদের ধোঁকা দিয়ে যাবে। ব্ড়ো হলেও সে বেশ হংশিয়ার। লাল ফৌজের ছেলেরা সবাই যে তর্ণ, হাসাহাসি করে। ছ্টি পেলেই তারা ভলিবল খেলে। হরেক রকমের মেয়েও আছে তাতে... যেমন কাতিউশা!'

ভ্রূকুঞ্চিত করে ম্দ্ স্বরে গেওর্গি গান ধরল:

আবার দেখি চাঁদ উঠেছে, কবে যে হবে শেষ।
তিন রাত্তির ঘ্ম নেই ক, টহল দিয়ে যাই রে।
শত্র্ আসে চুপিসারে, ঘ্মিও না মোর দেশ!
বৃদ্ধ আমি, শক্তিহীন, হতভাগ্য হায় রে!

তারপরে গলার স্বর বদলে কোরাসের ধ্য়া ধরল সে:

শান্তিতে ব্ড়ো... শান্তিতে!

'শান্তিতে মানে?' র্মাল দিয়ে ঠোঁটের ধ্লো ম্ছে ওলগা জিজ্ঞাসা করল।

চাবি ঠুকতে ঠুকতেই গেওর্গি বুঝিয়ে বলল, 'এর মানে, ভাবনা নেই বুড়ো, শান্তিতে ঘুমোও। সেনাদল আর কম্যান্ডাররা বহু আগেই যে যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ওলিয়া, আপনার ছোট বোনটির সঙ্গে আমার যে দেখা হয়েছিল, সে কথা কিছু বলেছে?'

'বলেছে, আমি তাকে সে জন্য ধমকেছি।'

'ঠিক করেন নি। বেশ মজার মেয়ে সে। আমি যদি বলি এ্যাঁ! তো সে ভেঙচি কেটে বলে ব্যা!'

'ওই মজার মেয়েই আবার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ করে ছাড়ে,' বলল ওলগা। 'তিমুর নামে একটা ছেলে ওর পেছনে পেছনে ঘুরছে। সে ঐ গুন্ডা কভাকিনের দলের। আমাদের বাড়ি থেকে কিছুতেই ওকে ভাগাতে পারছি না।'

'তিমুর?.. হুম...' বিব্রত বোধ করে কাশল গেওর্গি। 'সে ঐ দলে আছে বলতে চান? আমার তো মনে হয় না সে... অমন হওয়ার তো কথা নয়। যাক গে! কিছু ভাববেন না। আমি ওকে আপনাদের বাড়ি ছাড়া করব। ওলিয়া, আপনি গান শেখেন না কেন? ইঞ্জিনিয়ার ফুঃ! আমি তো নিজেই একজন ইঞ্জিনিয়ার — তাতে কি লাভ হল?'

'কেন আপনি কি ইঞ্জিনিয়ার খারাপ?'

'খারাপ হব কেন?' জবাব দিল গেওর্গি। ওলগার কাছে সরে এসে সে সামনের চাকার নাভিটা ঠোকাঠুকি করতে লাগল। 'মোটেই খারাপ ইঞ্জিনিয়ার নই। তবে আপনি এত ভাল গাইতে বাজাতে পারেন।'

'দেখুন গেওর্গি,' ওলগা একটু ঘাবড়ে গিয়ে সরে দাঁড়াল। 'আপনি যে কেমন ইঞ্জিনিয়ার তা বলতে পারি না, তবে সাইকেল মেরামত করার কায়দাটা আপনার অদ্ভুত।'

অঙ্গভঙ্গি করে দেখাল ওলগা কেমন করে সে কখনো এটা ঠুকছে, কখনো ওটা ঠুকছে।

'এতে তো তেমন অদ্ভুত কিছু নেই। সবই তো ঠিক ঠিক করছি আমি।' সে দাঁড়িয়ে উঠে ফ্রেমটায় রেঞ্চ দিয়ে ঘা মারল। 'এই তো কাজ শেষ হল এবার! ওলিয়া, আপনার বাবা কি লাল ফৌজের কম্যান্ডার?'

'হ্যাঁ।'

'খুব ভাল কথা। আমিও তাই।'

'আপনাকে বোঝাই দায়!' কাঁধ কুঁচকিয়ে বলল ওলগা। 'প্রথমে তো বললেন আপনি একজন ইঞ্জিনিয়ার, তারপরে হলেন অভিনেতা, এখন শুনছি কম্যান্ডার। হয়ত বিমানচালকও হবেন তাহলে?'

'না,' হেসে উঠল গেওর্গি। 'বিমানচালকেরা আকাশ থেকে লোকের মাথায় বোমা মারে। আর আমরা মাটির ওপর লোহা কংক্রীট ভেদ করে সোজা মারি বুকে।'

আবার তাদের সামনে ঝলক দিতে লাগল রাই ক্ষেত, কুঞ্জবন, নদী। কিছুক্ষণের ভেতরেই তারা ওলগাদের বাড়িতে এসে নামল।

মোটর সাইকেলের শব্দ শুনেই জেনিয়া একলাফে ছুটে এল অলিন্দ থেকে। গেওর্গিকে দেখে থতোমতো খেল সে। তারপর সে চলে যেতে ওলগার কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে ঈর্ষাভরে বলল, 'ও! আজ তোমার কি ভাগ্য ওলিয়া!'

২৪ নম্বর বাড়ির বাগানের কাছে কখন, কোথায়, কিভাবে সবাই এসে জড় হবে তা ঠিকঠাক করে ভজনালয়ের ছেলেরা নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

শুধু হোঁৎকা রয়ে গেল সেখানে। ভজনালয়ের ভেতরে নিস্তব্ধতা দেখে তার যেমন রাগ হচ্ছিল, তেমনি অবাকও লাগছিল তার। বন্দীরা না চেঁচাচ্ছে, না ধাক্কাচ্ছে দরজায়, না দিচ্ছে তার চিৎকারে কোন সাড়া।

সে তখন এক ফন্দি আঁটল। বাইরের দরজাটা খুলে সে পাথরের দেয়াল দেওয়া দেউড়ির মধ্যে ঢুকে দম বন্ধ করে রইল, যেন কেউ নেই আর।

তালার ফুটোয় কান রেখে যখন সেখানে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তখন বাইরের লোহার দরজাটা এমন ঝনঝনিয়ে বন্ধ হয়ে গেল যে মনে হল কে যেন লাঠি দিয়ে বাড়ি মারল দরজায়।

সে দরজার কাছে লাফিয়ে গিয়ে রেগে মেগে জিজ্ঞাসা করল, 'এই ওখানে কে? চালাকি বন্ধ কর — না হলে থাপ্পড় লাগাব বলে দিলাম!'

কেউ জবাব দিল না। বাইরে থেকে অপরিচিত স্বর তার কানে এল। খড়খড়িগুলো খুলতে গিয়ে ক্যাঁচ করে উঠল। জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে কে যেন বন্দীদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করেছে। তারপর ভজনালয়ের ভেতরের ছেলেরা হাসিতে ফেটে পড়ল। সেই হাসির শব্দে হোঁৎকা বেশ অস্বস্তি বোধ করল।

অবশেষে বাইরের দরজা খুলে গেল। চৌকাঠে হোঁৎকার সামনে এসে দাঁড়াল তিমুর, সিমাকভ আর লাদিগিন।

জায়গা থেকে না নড়ে তিমুর আদেশ দিল, 'দ্বিতীয় দরজা খোলো! ভালো চাও তো নিজেই গিয়ে দরজা খুলে দাও!'

অনিচ্ছার সঙ্গে হোঁৎকা খিল খুলে দিল। কলিয়া আর গেইকা ভজনালয়ের বাইরে এল চলে।

তিমুর আদেশ দিল, 'এবার ওদের জায়গায় গিয়ে ঢোক, পাজি কোথাকার, শীগগির ঢোক!' ঘুষি পাকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'তোর সঙ্গে কথা বলার একটুও সময় নেই আমার!'

হোৎকা ঢুকে যেতে দুটো দরজাই বন্ধ করে দেওয়া হল। লোহার কড়ার ভেতরে ভারী খিল দিয়ে বন্ধ করা হল তালা।

তারপর তিমুর একটা কাগজ নিয়ে নিজের নীল পেন্সিলটা দিয়ে নীচের কথা কয়টি তাতে লিখল:

'ক্ভাকিন, ওদের পাহারা দেবার দরকার নেই। ওদের তালা বন্ধ করে আমি চাবি নিয়ে গেলাম। আজ সন্ধ্যেয় সোজা বাগানে হাজির হব।'

ওরা সরে পড়তেই মিনিট পাঁচেক পরে ক্ভাকিন গেট দিয়ে ঢুকল।

চিঠিটা পড়ে, তালাটা নেড়ে দেখে, একটু হেসে সে গেটের দিকে ফিরে এল। হোৎকা এদিকে লোহার দরজায় ঘুষি আর লাথি মারছে পাগলের মতো।

গেটের কাছে এসে ক্ভাকিন ঘুরে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্তভাবে বিড়বিড় করে বলল, 'আর গেইকা, যত পারিস ধাক্কা মার! সন্ধ্যে পর্যন্ত ওই ধাক্কাই মেরে যাবি।'

পরের ঘটনাটা এই রকম।

সূর্যাস্তের ঠিক আগেই তিমুর আর সিমাকভ হাটখোলায় গেল।

ঘেঁষাঘেঁষি এলোমেলো দোকানের সারি চলে গেছে। কোনটা সরবতের, কোনটা শাকসব্জীর, কোনটা তামাকের, রুটির বা আইসক্রীমের; একেবারে শেষে বেঢপ একটা গুমটিঘর, সেখানে হাটের দিনে মুচি এসে কাজ করে।

তিমুর আর সিমাকভ সেই গুমটিঘরে কাটাল কিছুক্ষণ।

সন্ধ্যা হতেই গোলাবাড়ির টঙের চাকাটার কাজ সুরু হল। একটার পর একটা তারে টান পড়ল। এবং তাতে করে প্রয়োজনীয় স্থানে প্রয়োজনীয় সঙ্কেত পাঠান হল।

সাহায্যও আসতে আরম্ভ করল। ইতিমধ্যে অনেক ছেলে এসে জমেছে — প্রায় বিশ-তিরিশ জন তো হবেই। বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে হামাগুড়ি দিয়ে আরও আসছে নিঃশব্দে।

তানিয়া আর নিউরকাকে ফেরত পাঠান হল। জেনিয়া রইল বাড়িতেই। তার কাজ হল ওলগাকে বাগানে যেতে না দেওয়া।

তিমুর চাকার কাছে দাঁড়িয়ে।

জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে উদ্বিগ্নভাবে সিমাকভ বলল, 'ছ নম্বর তারে আবার সঙ্কেত পাঠাও। সেদিক থেকে কেন জানি সাড়া মিলছে না।'

একটা তক্তায় দুজন ছেলে কি যেন লেখায় ব্যস্ত। লাদিগিনের দল এসে হাজির হল।

সকলের শেষে গুপ্তচরের দল সংবাদ নিয়ে এল। ২৪ নম্বরের বাগানের কাছে ফাঁকা ডাঙাটায় কভাকিনের দলবল জড় হয়েছে।

তিমুর বলল, 'এবার সুরু করতে হয়। সবাই তৈরি হও!'

চাকা ছেড়ে দিয়ে একটা দড়ি ধরে টান দিল সে। পুরোনো গোলাবাড়ির ওপর ধীরে ধীরে উঠে পতপত করে উড়তে লাগল দলের পতাকা। তার ওপর এসে পড়েছে উড়ন্ত মেঘের ফাঁক থেকে ছাড়াছাড়া চাঁদের আলো — এ হল যুদ্ধের সঙ্কেত।

...২৪ নম্বরের বেড়ার পাশ দিয়ে গুটিগুটি চলেছে দশটি ছেলের একটি দল। ছায়ায় দাঁড়িয়ে কভাকিন বলল, 'হোঁৎকা বাদে সবাই এখানে হাজির।'

'চালাক ছেলে,' কে যেন বলল। 'হয়ত সে আগেই বাগানে এসে ঢুকেছে। ও তো সব সময়েই আগে থাকে।'

আগেই আলগা করে রাখা ছিল দুটো তক্তা, বেড়া থেকে তা সরিয়ে কভাকিন পার হয়ে গেল। অন্যেরা তার পেছনে পেছনে চলল। আলিওশকা পাহারা দেবার জন্য দাঁড়িয়ে রইল রাস্তায়।

রাস্তার অন্য পারে নর্দমায় আগাছা আর বিছুটি ঝোপের আড়ালে পাঁচটি মাথা উঁকি মারল। তাদের মধ্যে চারজন আবার সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গেল। পঞ্চম মাথাটি কলিয়া কলোকলচিকভের। সে একটু দেরি করছিল। মাথার ওপর একটা হাতের থাবড়া পড়তে তাও অদৃশ্য হল। সান্ত্রী আলিওশকা চারিদিকে তাকাল। সব নিস্তব্ধ। বাগানের ভেতর কী হচ্ছে শুনবার জন্য সে মাথা গলিয়ে দিল বেড়ার ফোকর দিয়ে। তিনটি ছেলে নর্দমা থেকে উঠে এল গুঁড়ি মেরে। পরমুহূর্তেই সান্ত্রী অনুভব করল সবল মুঠিতে তার হাত আর পা কে চেপে ধরেছে। কিন্তু চেঁচিয়ে উঠতে পারার আগেই তাকে ধাক্কা দিয়ে বেড়ার কাছ থেকে ঠেলে দেওয়া হল।

'গেইকা', মাথা তুলে সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, 'কোত্থেকে তুই এলি?'

গেইকা হিসহিস করে বলল, 'ওখান থেকে। ভাল চাস তো চুপ করে থাক! না হলে কিন্তু তুই যে আমার দিকে টেনে কথা বলেছিলি সে কথা মনেও রাখব না।'

'বেশ তাই হবে', রাজি হল আলিওশকা, 'আমি মুখ বুজে থাকব।' বলেই হঠাৎ তীব্র শিস দিয়ে উঠল।

গেইকা চওড়া হাতের তেলোয় সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখ সেঁটে বন্ধ করে দিল। কারা যেন তার ঘাড় আর পা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল।

বাগানের ছেলেরা শিস শুনতে পেয়েছিল। ক্‌ভাকিন ঘুরে দাঁড়াল কিন্তু শিস আর দ্বিতীয়বার শোনা গেল না। চারিদিকে ভালো করে তাকাল সে। মনে হল বাগানের কোণের দিকে ঝোপঝাড়গুলো যেন নড়ছে।

চাপা গলায় সে ডাকল, 'এই হোঁৎকা? ওখানে বুঝি লুকিয়ে আছিস? গবেট কোথাকার!'

কে যেন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'মিশ্‌কা পালিয়ে আয়! মালিকরা আসছে!'

কিন্তু যারা আসছিল তারা মালিক নয়।

পেছনের ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে অন্তত ডজনখানেক টর্চ একসঙ্গে জ্বলে উঠল। তাদের চোখ ধাঁধিয়ে, ঘাবড়ে দিয়ে তারা চট্‌পট এগিয়ে এল শত্রুদের দিকে।

পকেটে হাত পুরে একটা আপেল বের করে আলোর দিকে ছুঁড়ে মেরে ক্‌ভাকিন চেঁচাল, 'লড়ে যা, লড়ে যা, কেউ পালাবি না! টর্চগুলো হাত থেকে হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নে! তিমুর লড়াই করতে এসেছে!'

একটা ঝোপের আড়াল থেকে তড়াক করে লাফিয়ে সিমাকভ চট করে বলল, 'ওদিকে তিমুর আর এদিকেতে সিমা!'

পেছন আর দুপাশ থেকে আরো জনা বারো ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর।

গাঁকগাঁক করলে ক্‌ভাকিন, 'ওহো! রীতিমত সেনাবাহিনী, বেড়ার দিকে সবাই পালা!'

ফাঁদে পড়া দলটা আতঙ্কে বেড়ার দিকে পালাল। ধাক্কাধাক্কি করে, কপালে চোট খেয়ে তারা রাস্তায় নেমে এল হুড়মুড় করে, আর সোজা গিয়ে পড়ল লাদিগিন আর গেইকার কবলে।

মেঘের আড়ালে তখন চাঁদ ঢাকা পড়েছে। অন্ধকারে শুধু গলা শোনা যেতে লাগল:

'ছেড়ে দে!'

'খবর্দার!'

'গায়ে হাত দিবি না, বলছি!'

'সবাই চুপ!' অন্ধকারে তিমুরের গলা শোনা গেল। 'বন্দীদের মারা চলবে না। গেইকা কোথায়?'

'এই যে আমি এখানে!'

'ওদের নিয়ে চল!'

'যদি না যেতে চায়?'

'প্রতিমার মতো ঘটা করে হাত-পা ধরে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাবে।'

কে যেন ককিয়ে উঠল, 'ছেড়ে দে শালা!'

তিমুর অগ্নিশর্মা হয়ে হাঁক দিল, 'ওটা কেরে? গুণ্ডামিতে ওস্তাদ আর ফাঁদে পড়ে কাঁদুনি? গেইকা, হুকুম দে রওনা হবার।'

হাটখোলার এককোণায় খালি গুমটিঘরটায় গিয়ে বন্দীদের একজনের পর একজনকে ভেতরে পুরে দেওয়া হল।

তিমুর হুকুম করল, 'কভাকিনকে নিয়ে আয় আমার কাছে।' কভাকিনকে আনা হল।

তিমুর জিজ্ঞাসা করল, 'সব তৈরি?'

'তৈরি।'

শেষ বন্দীটিকে গুমটিঘরে ঠেলে দিয়ে বাইরে খিল এঁটে মোটা তালাবন্ধ করে দেওয়া হল।

তিমুর কভাকিনকে বলল, 'যা পালা। তুই তো একটা ভাঁড় রে! তোকে আবার ভয় কি, তোকে আমাদের দরকার নেই।'

কভাকিন ভেবেছিল তাকে মার দেওয়া হবে, কিছুই না বুঝে মাথা হেঁট করে সে দাঁড়িয়ে রইল।

তিমুর আবার বলল, 'দৌড়ো! এই চাবিটা নিয়ে তোর শাগরেদ হোঁৎকাকে ভজনালয়ের দরজা খুলে বার করে নিস।'

কভাকিন নড়ল না।

গোমড়া মুখে সে বলল, 'ওদের ছেড়ে দে, নয়তো আমাকেও পুরে রাখ ওদের সঙ্গে।'

তিমুর বলল, 'উঁহুঁ, সে সব খতম হয়ে গেছে। ওদের সঙ্গে তোর, আর তোর সঙ্গে ওদের আর কোনো সম্পর্কই চলবে না।'

ঘাড় নীচু করে ধীরে ধীরে কভাকিন যখন চলে যাচ্ছে, তখন বেড়ালের ডাক আর শিসের বেসুরো আওয়াজ উঠল চারিদিকে। দশ পা এগিয়ে সে টানটান হয়ে দাঁড়াল।

'মেরে তোর ভূত ভাগিয়ে দেব!' সে রেগে চীৎকার করে তিমুরকে বলল। 'তোকে একা। লড়ে ছাতু করে দেব।' বলেই সে মিশে গেল অন্ধকারে।

'লাদিগিন, তুই তোর পাঁচজনকে নিয়ে এবার যেতে পারিস।' তিমুর বলল। 'তোদের এখন কি কাজ?'

‘২২ নম্বর বল্‌শায়া ভাসিলকোভ্‌স্কায়াতে — কাঠ সাজানো।’

‘ঠিক আছে, কাজে লেগে যা!’

কাছের স্টেশনে একটা বাঁশি বেজে উঠল। শহরতলীর গাড়ি সবে এসে থেমেছে, লোকজন নামতে আরম্ভ করেছে। তিমুর তাড়া দিল।

‘সিমাকভ, তোর আর তোর পাঁচজনের — কি কাজ?’

‘৩৮ নম্বরের মালায়া পেত্রাকোভ্‌স্কায়ায়।’ তারপর হাসতে হাসতে বলল, ‘কাজ সেই বালতি, পিপে, জল! হিপ্‌ হিপ্‌ হুররে! চল্লাম!’

‘ঠিক আছে! সবাই কাজে লেগে যাও! এইরে লোকজন এদিকে আসতে আরম্ভ করছে। বাকি সবাই বাড়ি যেতে পারো। চটপট।’

চত্বরে উঠল বিকট আওয়াজ আর দরজা ধাক্কার শব্দ। ট্রেন থেকে আগত যাত্রীরা ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফের শোনা গেল চিৎকার আর দরজা ধাক্কার শব্দ। আশেপাশের বাড়ির জানালায় আলো জ্বলে উঠল। কে একজন দোকান ঘরগুলোর আলো জেবলে দিল। লোকে ভিড় করে এসে দেখতে পেল যে সেখানে এই বিজ্ঞাপ্তিটি লটকানো রয়েছে:

পথচারীরা — মোটেই সহানুভূতি দেখাবেন না!

এর ভিতরে যারা আছে তারা রাত্রে শান্তিকামী অধিবাসীদের বাগানে কাপুরুষের মতো ঢুকে ফল চুরি করে।

এই বিজ্ঞাপ্তির পিছনেই তালার চাবি আছে, যিনি বন্দীদের মুক্তি দেবেন তিনি আগে দেখে নিন তাঁর কোন আত্মীয় বা চেনা ছেলে এদের মধ্যে আছে কিনা।

বেশ রাত হয়েছে। গেটগুলোয় কালো দাগ-দেওয়া লাল তারকাদের আর দেখা যাচ্ছে না।

সুন্দর চুল ছোট্ট খুকিটি যে বাড়িতে থাকে সেই বাড়ির বাগান। শাখাবহুল একটা গাছ থেকে নেমে এল দুটো দড়ি। তার পেছু পেছু গাছের খড়খড়ে গুঁড়ি ধরে একটি ছেলে নেমে দড়ির সঙ্গে একটা তক্তা বেঁধে দিল। তারপর সে ওর ওপর বসে দেখল নতুন দোলনাটা — বেশ মজবুত হয়েছে কিনা।

শক্ত ডালটা একটু ক্যাঁচ করে উঠল, পাতাগুলো খসখস করে নড়ে উঠল।

ভয় পেয়ে ধড় ফড়িয়ে একটা পাখি কিঁচকিঁচ করে উঠল। রাত বেশ গভীর, ওলগা অনেক আগেই শুয়ে পড়েছে। জেনিয়াও ঘুমোচ্ছে। তেমনি ঘুমোচ্ছে ছেলেটির বন্ধুবান্ধবেরা — হাসিখুসি সিমাকভ, মুখ চোরা লাদিগিন, হাস্যকর কলিয়া। নির্ভীক গেইকা তো নিশ্চয় বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে ঘুমের মধ্যেই বকে চলেছে।

পাহারা ঘরের ঘড়িতে পনেরো মিনিটের ঘণ্টা বাজল: দিন গেল — কাজ হল! ঢং ঢং... এক দুই!..

না রাত অনেক হয়েছে।

ছেলেটি দোলনা থেকে নেমে ঘাসের মধ্যে কি যেন খুঁজল। তারপর জংলী ফুলের ভারি একটা তোড়া তুলে নিল।

ফুলগুলো তুলেছিল জেনিয়া।

পা টিপে টিপে চলল সে যেন কারুর ঘুম না ভাঙে, কেউ ভয় না পায়। খুব সন্তর্পণে সে জ্যোৎস্না-ধোওয়া দাওয়ার সিঁড়ি বেয়ে উঠল। তারপর সবচেয়ে উপরের পৈঠায় সযত্নে রেখে দিল তোড়াটা। ছেলেটি তিমুর।

এক রবিবারে এ এলাকায় কম্‌সমল সভ্যরা দূর প্রাচ্যের হাসান হ্রদে লাল ফৌজের বিজয়ের বার্ষিক উৎসব পালনের জন্য পার্কে বিরাট কার্নিভাল আর গান বাজনার আয়োজন করল।

মেয়ের দল খুব ভোরেই মেলার মাঠে গিয়ে হাজির হল। ওলগা তাড়াতাড়ি ব্লাউজ ইস্ত্রি শেষ করে পোশাক বাছতে বসল। জেনিয়ার ফ্রকটা ঝাড়তেই তার পকেট থেকে একটুকরো কাগজ ছিটকে পড়ল।

ওলগা সেটা কুড়িয়ে পড়তে লাগল, 'খুকি! ভয় নেই। সব ঠিক আছে। আমি কাউকে কিচ্ছু বলব না। তিমুর।'

কি বলবে না সে কাউকে? ওর ভয়ই বা কিসের? ওই মিটমিটে সেয়ানা মেয়েটা তার কাছ থেকে কি লুকিয়ে রাখছে? না! এর একটা হেস্তনেস্ত না করলেই নয়। যাবার সময় বাবা বলে গেছেন... কাজে চাই দৃঢ়তা আর দ্রুততা।

গেওর্গি জানালায় টোকা দিল।

বলল, 'ওলিয়া, আপনাকে সাহায্য করতেই হবে আমাকে! প্রতিনিধিদল এসেছিল আমার কাছে, বলছে আমি যেন কনসার্টে গান গাই। এমন একটা দিন! আমি তো তাদের ফেরাতে পারি নি। বলি কি, আপনি এ্যাকর্ডিয়ন নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গত করুন।'

'হ্যাঁ... কিন্তু আপনার জন্যে এটা তো করতে পাবে কোন পিয়ানো-বাজিয়ে?' ওলগা বিস্মিত হয়ে বলল। 'এ্যাকর্ডিয়ন চাইছেন কেন?'

'পিয়ানো-বাজিয়ের আমার দরকার নেই। আমি চাই আপনি বাজান! খাসা হবে তাতে। জানালা দিয়ে লাফিয়ে ভেতরে আসব? ইস্ত্রিটা সরিয়ে রেখে এ্যাকর্ডিয়নটা বের করুন দেখি? দাঁড়ান, আমি নিজেই বের করেছি। এখন আপনি শুধু চাবিগুলো টিপুন, আর আমি গান গাই।'

ক্ষুণ্ণ স্বরে ওলগা বলল, 'শুনুন গেওর্গি, দরজা থাকতে আপনার অন্তত জানালা গলে না এলেও চলত।'

পার্কে খুব হৈচৈ। ফূর্তিবাজদের দল নিয়ে গাড়ির পর গাড়ি এসেই চলেছে। স্যান্ডউইচ, বান, হাল্কা পানীয়, সসেজ, ক্যান্ডী আর বিস্কুট বয়ে নিয়ে এল কত ট্রাক।

ময়দানের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল নীল উর্দি-পরা হাতে করে বা ঠেলা গাড়িতে আইসক্রীম বিক্রেতাদের দল।

স্থানীয় বাগান-বাড়িগুলোর লোক, অভ্যাগতরা ঠাঁই নিয়েছে বনের ফাঁকাগুলোয় খাবার বিছিয়ে বসেছে তারা; সেখান থেকে উঠছে গ্রামোফোনের হরেক রকম সুর।

ব্যাণ্ডের বাদ্যি বাজছে।

একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি রেঞ্চ, ফিতে, পেরেক আর কিছু যন্ত্রপাতি নিয়েই কনসার্ট আসরে ঢুকতে যাচ্ছিল। আসরের দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে বকুনি দিচ্ছে বুড়ো দরোয়ান।

'শোন বাপু — এই সব যন্ত্রপাতি নিয়ে ভেতর ঢোকা চলবে না। আজ উৎসবের দিন। যাও, আগে বাড়ি যাও। তারপর হাতমুখ ধুয়ে পোশাক পরে নাও তো।'

'কিন্তু কনসার্ট তো বিনা পয়সায়? টিকিট তো লাগবে না?'

'তাতে কিছু যায় আসে না। এটা হল গানের আসর। বিনা পয়সা বলে তুমি তোমার ইলেকট্রিক পোস্ট নিয়ে এসেই বসবে নাকি? চলো ভাই চলো, এগিয়ে চলো।' আর একজনকে সে থামাল, 'ওহে শুনতে পাচ্ছ না, এখানে গান হচ্ছে — গান বাজনা। আর তোমার কিনা পকেট থেকে বোতল বেরিয়ে আছে।'

'শোন, বুড়োদাদু শোন,' হেঁচ্‌কি তুলে লোকটা বলল, 'আমার একটু চাই যে — আমি যে চড়া সুরের গাইয়ে।'

'সরে পড় হে, চড়া সুরের গাইয়ে,' জবাব দিলে দরোয়ানজী। মিস্ত্রির দিকে

দেখাল সে, 'এই তো একজন খাদের গাইয়ে, সে হট্টগোল করছে না, তোমাকেও তাই বলছি আপত্তি চলবে না।'

ওলগা এ্যাকর্ডিয়ন নিয়ে স্টেজের পেছনে গেছে, ছেলেদের কাছে এ কথা শুনে জেনিয়া তার জায়গায় বসে অস্থির হয়ে ছটফট করতে লাগল।

অবশেষে মঞ্চে এল ওলগা আর গেওর্গি। ভারি ভয় হল জেনিয়ার, এই বুঝি দর্শকরা ওলগাকে দেখে ঠাট্টা করে। কিন্তু কেউই ঠাট্টা করল না।

স্টেজে গেওর্গি আর ওলগাকে এত এত সহজ, এত তরুণ, এত হাসিখুসি দেখাচ্ছে যে জেনিয়ার ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে তাদের দু'জনকেই জড়িয়ে ধরে।

এ্যাকর্ডিয়নটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল ওলগা।

গেওর্গির কপালে গভীর রেখা ফুটে উঠল। সে ঘাড় কুঁজো করে মাথাটা নীচু করল। এখন সে বুড়ো মানুষ। নিচু সুরেলা গলায় সে গাইতে লাগল:

তিনরাত্তির ঘুম নেইক, নীরব থমথমে,
কেবলি ভাবি বুঝিবা এল, বুঝিবা ওই এল।
হাতের অস্ত্র থরো থরো, বুকে শঙ্কা জমে,
এ যেন সেই কুড়ি বছর আগের রাতগুলো।
তবুও যদি মুখোমুখি হতেই হয় আবার,
রে সৈনিক, ভাড়াটিয়া, ক্রুর শত্রুদল,
বুড়ো হলেও তেমনি আজো লড়াইয়ে তৈয়ার!
কুড়ি বছর আগের মতোই কঠোর অবিচল।

'কি সুন্দর! খোঁড়া বুড়োটা কি সাহসী! বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে! সাবাস, সাবাস!' জেনিয়া বিড়বিড় করে নিজের মনে, 'ঠিক হচ্ছে ওলিয়া, বাজিয়ে যাও! ইস্, বাবা তোমার বাজনা শুনতে পেলেন না।'

কনসার্টের পরে গেওর্গি আর ওলগা হাত ধরাধরি করে তরুবীথি ধরে পায়চারি করতে লাগল।

ওলগা বলছিল, 'সবই হল, কিন্তু জেনিয়াটা যে কোথায় গেল জানি না।'

গেওর্গি বলল, 'সে তো বেঞ্চিতে বসে 'ব্রেভো! ব্রেভো!' বলে চেঁচাচ্ছিল। তারপর...' গেওর্গি একটু থতমত খেয়ে বলল, 'তারপর একটি ছেলে তার কাছে আসতে তারা কোথায় চলে গেল যেন।'

ওলগা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন ছেলে? গেওর্গি, আপনি তো আমার চেয়ে বয়সে বড়। বলুন তো ওকে নিয়ে কি করি? দেখুন না, এই চিরকুটটা আজ সকালে পেলাম!'

চিরকুটটা পড়ল গেওর্গি। এবার নিজেই সে ভাবনায় পড়ল, ভ্রূ কোঁচকাল।

'ভয় পেও না মানে তো কথা শুনো না। একবার যদি ছেলেটার দেখা পেতাম তাহলে টের পাওয়াতাম মজা!'

ওলগা চিরকুটটা লুকিয়ে রাখল। কয়েক মুহূর্ত তারা চুপ করে রইল। কিন্তু এমন চমৎকার বাজনা হচ্ছিল, সকলে এত হাসিখুসি যে তারাও আবার হাত ধরাধরি করে বেড়াতে আরম্ভ করে দিল।

হঠাৎ একটা মোড় ফিরতেই তাদেরই মতো এক যুগলের মুখোমুখি পড়ে গেল তারা। তাদেরই মতো হাত ধরাধরি করে তারা আসছিল তাদের দিকে। এরা — তিমুর আর জেনিয়া।

দুই দলই বিব্রত হয়ে হাঁটতে হাঁটতেই পরস্পরকে ভদ্রভাবে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল।

ওলগা মরিয়া হয়ে গেওর্গির আস্তিনটায় টান দিয়ে বলল, 'ওই সেই ছেলেটা!'

কুণ্ঠিতভাবে গেওর্গি উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, তার চেয়েও সাঙ্ঘাতিক কি জানেন — ও তিমুর। আমারই বেপরোয়া ভাইপো।'

'তুমি মানে — আপনি সব জানতেন!' রেগে উঠল ওলগা, 'অথচ আমাকে একটা কথাও বলেন নি!'

এক ঝাঁকিতে তার হাত ছাড়িয়ে ওলগা দৌড়ে গেল বীথি ধরে। কিন্তু জেনিয়া কি তিমুর কাউকেই দেখতে পেল না। একটা সরু বাঁকা হাঁটা পথে বাঁক নিতেই অবশেষে সে তিমুরের দেখা পেল। হোঁৎকা আর কভাকিনের মুখোমুখি সে দাঁড়িয়েছিল।

তার একেবারে কাছে এসে ওলগা বলল, 'শোন তো, লোকের বাগানে ঢুকে চুরি কর, গাছ ভাঙ্গ, এমনকি বুড়ির আর বাপ-মরা ছোট্ট মেয়েটার বাড়িও বাদ দাও না, তাতেও বুঝি তোমার সাধ মেটে নি? তোমাদের দেখলে কুকুরও যে পালায় — তাতেও বুঝি শিক্ষা হয় না! শেষে কিনা আমার ছোট বোনটাকেও নষ্ট করছ। আমার পেছনে লাগিয়ে দিয়েছ? পাইওনিয়র দলের টাই পরা হয়েছে দেখছি — অথচ একেবারে বদমাইসের ধাড়ি।'

বিবর্ণ হয়ে গেল তিমুর।

বলল, 'তা ঠিক নয়। আপনি ব্যাপারটা জানেন না।'

হাত নেড়ে কথাটাকে উড়িয়ে দিয়ে ওলগা ছুটল জেনিয়াকে খুঁজতে।

তিমুর সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। একটি কথাও বলল না।

হোঁৎকা ও কভাকিনও দাঁড়িয়ে রইল হতভম্ব হয়ে।

'কেমন কমিসার!' কভাকিন বলল। 'তোমাকেও তাহলে কষ্ট পোহাতে হয়?'

আস্তে আস্তে চোখ তুলে তিমুর জবাব দিল, 'হ্যাঁ, সর্দার। তা কষ্টই বটে। তোমাদের জন্যে এই সব শোনার চেয়ে তোমাদের হাতে ধরা পড়ে দু ঘা খাওয়াও ছিল ভাল।'

চাপা হাসির সঙ্গে কভাকিন উত্তর দিল, 'কেন চুপ করেছিলে? বললেই তো পারতে তুমি না আমরা। আমরা তো এখানেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

হোঁৎকাও উল্লসিত হয়ে সায় দিল, 'ঠিকই তো, বললেই তো পারতে তাহলে আমরাও তোমার চোয়ালে মারতাম এক ঘুষি।'

কিন্তু হোঁৎকার কাছ থেকে ঠিক এই ধরনের সায় আশা করে নি কভাকিন। নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল বন্ধুর দিকে। ইতিমধ্যে তিমুর গাছের গুঁড়িগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল।

কভাকিন ধীরে ধীরে বলল, 'দারুণ দেমাক ওর। কান্না পাচ্ছে তবুও কাঁদবেন না!'

হোঁৎকা জবাব দিল, 'আয় না ওর কান্নার ব্যবস্থা করে দিই।' বলেই সে দৌড়ে গিয়ে ফারগাছের একটা মোচা ছুঁড়ে মারল তিমুরের দিকে।

কভাকিন রুক্ষভাবে বলল, 'ও দেমাকী আর তুই — তুই একটা নচ্ছার।' বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে এক ঘুষি মারল হোঁৎকার মাথায়।

হোঁৎকা হাঁ হয়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠেই সে পালাতে গেল। দু' বার তার পাল্লা ধরে কভাকিন আরও দু ঘা বসিয়ে দিল তার পিঠে।

অবশেষে কভাকিন থামল। খসে পড়া টুপিটা তুলে নিয়ে ঝাঁকি দিয়ে হাঁটুতে ঘা মেরে তা থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলল। তারপর একটা আইসক্রীমওয়ালার কাছ থেকে আইসক্রীম কিনে গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। সেখানে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বড়ো বড়ো খণ্ডে লোভীর মতো খেতে লাগল আইসক্রীমটা!

...চাঁদমারির কাছে ফাঁকা মাঠটায় তিমুর দেখা পেল গেইকা আর সিমার।

সিমা হুঁশিয়ার করে দিল, 'তিমুর, তোর কাকা তোকে খুঁজছেন। মনে হচ্ছে ভারি রেগে গেছেন।'

'জানি, বাড়ি চললাম।'

'আবার ফিরবি তো?'

'জানি না।'

গেইকা হঠাৎ বন্ধুর হাত ধরে দরদভরে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে রে?

আমরা তো কারুর কোন অনিষ্ট করি নি। আর তুই তো জানিস। কেউ যখন উচিত কাজ করে...'

'হ্যাঁ তা জানি, জগতে সে কিছুরই ভয় করে না। কিন্তু কষ্টটা ঠিকই লাগে।'

তিমুর পা চালিয়ে চলে গেল।

ইতিমধ্যে জেনিয়া দৌড়ে এসেছে ওলিয়ার কাছে, সে তখন এ্যাকর্ডিয়নটা নিয়ে বাড়ি যাচ্ছে।

'ওলিয়া!'

বোনের দিকে না ফিরেই সে বলল, 'যা, ভাগ্। আর কথা বলতে চাই না তোর সঙ্গে। এক্ষুনি আমি মস্কো চলে যাচ্ছি। এবার যার সঙ্গে খুশি টোটো করে বেড়াতে পারিস সারা রাত।'

'কিন্তু, ওলিয়া...'

'কথা বলতে চাই না তোর সঙ্গে। পরশুদিন আমরা মস্কো ফিরে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করব বাবার জন্যে।'

'হ্যাঁ! বাবাই, তুই নোস — তিনি সবই বুঝবেন!' রাগে কান্নায় চেঁচিয়ে উঠল জেনিয়া। তিমুরের খোঁজে ছুটল সে।

গেইকা আর সিমাকভকে দেখতে পেয়ে সে জিজ্ঞাসা করল তিমুর কোথায়।

গেইকা বলল, 'তাকে বাড়িতে ডেকেছে। তোমার জন্যে তার কাকা তার উপর রেগে আগুন হয়ে গেছে!'

জেনিয়া রাগে কি করবে ঠিক পেল না, হাত পাকিয়ে সে পা দাপাতে লাগল, 'বাস! কারণ নেই, কিছু নেই, অথচ লোকের শাস্তি!'

দু হাত দিয়ে সে একটা বার্চগাছের গুঁড়ি জড়িয়ে ধরল। ঠিক তক্ষুনি তানিয়া আর নিউরকা ছুটে এল তার কাছে।

তানিয়া বলল, 'কি ব্যাপার জেনিয়া? কি হল তোর, চল, শীগ্গির! একজন এ্যাকর্ডিয়ন বাজিয়ে এসেছে — নাচ আরম্ভ হয়ে গেছে, মেয়েরা সবাই নাচছে।'

তারা দুজনে তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল সেই চক্করে যেখানে ফুলের মতো ঝলমলে ফ্রক, ব্লাউজ আর ড্রেস ঝলক দিয়ে উঠছে।

'জেনিয়া কাঁদতে নেই, ছিঃ!' বরাবরের মতোই দাঁতে দাঁত চেপে তড়বড় করে বলল নিউরকা, 'ঠাকুমাও তো আমাকে মাঝে মাঝে মারেন। কিন্তু আমি কখনো কাঁদি না! আয় মেয়েরা — নাচের দলে এগো!'

'এগো!' জেনিয়াও সুর মেলাল।

লোকেদের সারি ভেঙে তারাও চক্করের ভেতরে ঢুকে নাচের তালে পাক খেতে লাগল উদ্দাম আনন্দে।

...তিমুর বাড়িতে ঢুকতেই তার কাকা তাকে ডাকল।

বললেন 'তোর নৈশ অভিযানে আমার তিতি বিরক্তি ধরে গেছে। তোর দড়িদড়া, নিশানা, ঘণ্টা এসব তো জ্বালিয়ে খেল আমাকে। কি পাগলামী করেছিলি কম্বল নিয়ে?'

'একটা ভুল হয়েছিল।'

'খাসা একটা ভুল! আর বলে দিলাম ঐ মেয়েটার কাছে যাবি না। ওর দিদি তোকে দেখতে পারে না।'

'কেন?'

'সে জানি না। তবে তোর কাজেরই ফল নিশ্চয়। কি সব চিরকুট লিখেছিস? ভোরবেলা বাগানে কি সব বিদ্ঘুটে জমায়েত করিস তোরা? ওলিয়া বলছিল মেয়েটাকে নাকি গুণ্ডামি শেখাচ্ছিস!'

তাচ্ছিল্যভরে তিমুর জবাব দিল, 'মিথ্যে কথা বলেছে। এদিকে নাকি আবার কম্সমল সভ্য! ব্যাপার কি তা না জানলে আমাকে তো ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পারত। আমি বুঝিয়ে দিতাম।'

'বেশ। তবে এ পর্যন্ত তাকে যখন কিছু বলিস নি, আমি বারণ করে দিচ্ছি ও বাড়ির ত্রিসীমানা মাড়াবি না। আরও বলে দিচ্ছি যদি এই রকম নিজের খুসিমতো চলিস তাহলে তক্ষুনি তোকে তোর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেব।'

বেরুতে যাচ্ছিল সে।

তিমুর পিছু ডেকে তাকে থামাল, 'আচ্ছা কাকা। আপনারা যখন ছোটো ছিলেন তখন কি করতেন? কি খেলতেন?'

'আমরা? আমরা দৌড়োদৌড়ি, লাফালাফি, চালের ওপর ওঠা — এই সব করতাম, সময় সময় মারামারিও হত। কিন্তু আমাদের খেলাধুলা সবই ছিল সোজা — সবাই তা বুঝতে পারত।'

জেনিয়াকে শিক্ষা দেবার জন্যে ওলগা সেই সন্ধ্যাতে তার সঙ্গে কোন কথা না বলে মস্কো রওনা হয়ে গেল।

মস্কোয় তার কোনই কাজ ছিল না। তাই সে বাড়ি না গিয়ে এক বান্ধবীর কাছে গিয়ে আঁধার ঘনানো পর্যন্ত সময় কাটাল। বাড়িতে যখন পেঁছিল তখন প্রায় দশটা বাজে।

দরজা খুলে আলোটা জ্বালতেই সে চমকে উঠল: দরজায় একটা টেলিগ্রাম আটকান রয়েছে।

টেলিগ্রামের মোড়ক ছিঁড়ে ওলগা পড়ল সেটা। টেলিগ্রামটা তার বাবার।

সন্ধ্যের দিকে ট্রাকগুলো যখন পার্ক থেকে ফিরতে আরম্ভ করল, জেনিয়া আর তানিয়া দৌড়ল বাড়ির দিকে। ভলিবল খেলা শুরু হয়েছিল তাই জুতো জোড়া জেনিয়ার বদলে নিতে হয়।

জুতোর ফিতে বাঁধতে আরম্ভ করতেই সেই সুন্দর-চুল মেয়েটির মা তার ঘরে ঢুকলেন। বাচ্চাটি তাঁর কোলে ঘুমুচ্ছে।

ওলগা বাড়ি নেই শুনে মহিলাটি মুষড়ে পড়লেন।

বললেন, 'আমি মেয়েটিকে এখানে রেখে যেতে চেয়েছিলাম। তোমার দিদি যে বাড়ি নেই জানতাম না... আজ রাত্তিরেই গাড়ি আসছে, আর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আমায় মস্কো যেতেই হবে।'

জেনিয়া উত্তর দিল, 'ওকে আমার কাছে রেখে যান না। ওলগা এমনটা কি? আমি কি আর মানুষ নই? আমার বিছানায় ওকে শুইয়ে দিন। আমি অন্য বিছানায় শোব'খন।'

খুশি হয়ে মেয়ের মা বললেন, 'এখন ও নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। ভোরের আগে ওর ঘুম ভাঙবে না। মাঝে মাঝে ওর বালিশটা শুধু ঠিক করে দিতে হবে।'

মেয়েটির পোশাক ছাড়িয়ে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। তার মা চলে গেলেন। জানলা দিয়ে যাতে খাটটা দেখা যায় সেজন্য জেনিয়া পরদাটা সরিয়ে দিয়ে — দরজাটা ভেজিয়ে দিল। তারপর তানিয়ার সঙ্গে ছুটল ভলিবল খেলতে। সর্ত রইল যে খেলার ফাঁকে ফাঁকে তারা পালা করে দৌড়ে গিয়ে মেয়েটিকে দেখে আসবে।

তারা যেই না বেরিয়েছে অমনি এক পিয়ন তাদের দাওয়ায় এসে হাজির। অনেকক্ষণ দরজায় টোকা দিল সে, কোন সাড়া না পেয়ে সে পাশের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিল বাড়ির লোকেরা শহরে ফিরে গেছে কিনা।

প্রতিবেশী উত্তর দিল, 'না, এক মিনিট আগেও তো মেয়েটি এখানে ছিল। টেলিগ্রামটা আমিই তাকে দেবো'খন।'

সেই সই করে টেলিগ্রামটা নিল। সেটা পকেটে পুরে পাইপ ধরিয়ে জেনিয়ার জন্য একটা বেঞ্চের উপরে বসে অপেক্ষা করতে লাগল লোকটা। দেড়ঘণ্টা পরে ফিরে এল পিয়নটি।

বলল, 'আবার আরেকটা এসেছে। কী ব্যাপার? আগুন লেগেছে নাকি, এত তাড়া? এটাও ভাই নিয়ে রাখো।'

প্রতিবেশী সই করে দিল। ততক্ষণে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। গেট খুলে সিঁড়ি দিয়ে দাওয়ায় উঠে জানালায় উঁকি মারল সে। ভেতরে একটি ছোট মেয়ে ঘুমুচ্ছে। তার মাথার কাছে গুটিসুটি মেরে পাটকিলে রঙের একটা বেড়ালছানাও শুয়ে আছে বালিশের ওপর। বোঝা গেল বাড়ির লোক কাছেই কোথাও আছে।

ওপরকার জানালার দরজা খুলে সে টেলিগ্রামদুটো ভেতরে ফেলে দিল। নিখুঁতভাবে জানালার চৌকাঠে গিয়ে পড়ল তা। ওখানে থাকলে টেলিগ্রামদুটো চট করে জেনিয়ার চোখে পড়বে নিশ্চয়।

কিন্তু জেনিয়ার সেদিকে নজর গেল না। সে ভেতরে ঢুকে চাঁদের আলোয় মেয়েটির বালিশটা ঠিক করে দিল। তারপর বেড়ালছানাটাকে সরিয়ে দিয়ে পোশাক ছেড়ে শুয়ে পড়ল।

শুয়ে শুয়ে অনেকখন ধরে ভাবতে লাগল: দ্যাখো জীবনে কী না ঘটে! অথচ তার কোন দোষ নেই এতে; আবার ওলগারও যে দোষ আছে তাও বলা যায় না। তা সত্ত্বেও এই প্রথম তাদের মধ্যে এত বড় একটা ঝগড়া হয়ে গেল।

ভারি দুঃখ হল জেনিয়ার। কিছুতেই তার ঘুম আসছিল না। ঠিক করল জ্যাম দিয়ে একটুকরো রুটি খাবে। তড়াক করে বিছানা ছেড়ে এক ছুটে আলমারির কাছে এসে বাতি জ্বালতেই তার নজরে পড়ল জানালার চৌকাঠের ওপর দুটো টেলিগ্রাম।

তার বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। কাঁপা কাঁপা হাতে সে টেলিগ্রামদুটোর বাঁধন ছিঁড়ে পড়ল।

প্রথমটিতে লেখা:

'যাবার পথে রাত বারোটা থেকে ভোর তিনটে পর্যন্ত ওখানে থামব। শহরের বাড়িতে আমার জন্য অপেক্ষা কর। বাবা।'

দ্বিতীয়টিতে লেখা:

'এখুনি চলে আসবে, বাবা আজ রাত্রে শহরে ফিরছেন। ওলগা।'

সভয়ে জেনিয়া ঘড়ি দেখল। বারোটা বাজতে পনের মিনিট। ঝটপট পোশাকটা পরে, ঘুমন্ত শিশুটিকে তুলে নিয়ে সে আধপাগলার মতো ছুটল অলিন্দের দিকে। একটু যেতেই তার মত বদলাল। শিশুটিকে বিছানায় শুইয়ে রেখে একলাফে রাস্তায় পড়ে সে বুড়ি গয়লানীর বাড়ির দিকে ছুটল। সেখানে গিয়ে প্রতিবেশীটি জানালা দিয়ে মুখ না বের করা অবধি দরজায় সে দুমদাম কিল আর লাথি মেরে চলল।

ঘুমঘুম গলায় প্রতিবেশীটি জিজ্ঞাসা করল, 'দুমদুম করে ধাক্কা মারছিস কেন? মতলব কি তোর?'

'মতলব টতলব কিছু না,' মিনতি করে জানাল জেনিয়া। 'গয়লানী মাসীর সঙ্গে একটু দেখা করব! বাচ্চাটিকে তাঁর কাছে রেখে যেতে হবে।'

ঝপ্ করে জানালাটা বন্ধ করে প্রতিবেশীটি জানাল, 'যত ঝামেলা! বুড়ি তো কোন সকালে ভাইকে দেখতে গেছে তার গাঁয়ের বাড়িতে।'

স্টেশনে আসতে আসতে বাঁশি দিল একটা গাড়ি। একদৌড়ে রাস্তায় ছুটে

আসতে গিয়ে পক্ককেশ সম্ভ্রান্তদর্শন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ধাক্কা খেল জেনিয়া।

হুড়মুড় করে সে বলে গেল, 'মাপ করবেন, এটা কটার গাড়ি বলতে পারেন?'

সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ঘড়ি বার করে দেখলেন। বললেন, 'রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। মস্কো যাবার শেষ গাড়ি।'

'কি বলছেন, শেষ গাড়ি?' কান্না গিলে ফিসফিসিয়ে বললে জেনিয়া, 'এর পরেরটা কখন ছাড়ে?'

দিশাহারা মেয়েটির কাঁধে হাত দিয়ে আদর করে তিনি বললেন, 'পরেরটা ছাড়ে ভোর তিনটে চল্লিশে। কি হয়েছে তোমার খুকি? কাঁদছ না কি? বলো আমায় দেখি তোমায় কিছু সাহায্য করতে পারি কিনা?'

'না, না, আপনি পারবেন না!' বলেই জেনিয়া কোনক্রমে চোখের জল চেপে ছুটে বাড়ি এল। 'দুনিয়ায় কেউ এখন আমায় সাহায্য করতে পারে না।'

বাড়িতে ফিরেই সে বালিশে মুখ গুঁজল, পরমুহূর্তেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঘুমন্ত বাচ্চাটার দিকে সরোষে তাকিয়ে রইল। তারপর হুঁশ হতেই সে কম্বলটা টানটান করে দিয়ে পাটকিলে রঙের বেড়ালছানাটাকে বালিশ থেকে তাড়িয়ে দিল।

বারান্দা, রান্নাঘর আর ঘরের আলোগুলো সব জ্বালিয়ে দিয়ে সে সোফায় এসে বসে মাথা দোলাতে লাগল। মনে হয় বিশেষ কিছু না ভেবে বহুক্ষণই সে বসে রইল ঐ ভাবে। হঠাৎ তার হাত পড়ল পাশে শোয়ান এ্যাকর্ডিয়নটার ওপর। যন্ত্রের মতো সেটাকে তুলে নিয়ে সে চাবিগুলো টিপতে লাগল। একটা বিষণ্ণ গম্ভীর সুরে ভরে গেল ঘরটা। হঠাৎ বাজনা থামিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল জেনিয়া। কান্নার দমকে তার কাঁধদুটো কাঁপছিল।

না! একা একা এমন যন্ত্রণা ভোগ করার শক্তি তার আর নেই। একটা মোমবাতি জেবলে হোঁচট খেতে খেতে বাগানের মধ্যে দিয়ে গেল গোলাবাড়িটার দিকে। এবার সে টঙটায়। ওই তো দড়ি, মানচিত্র, থলে, নিশান; লণ্ঠনটা জেবলে সে চাকার কাছে গিয়ে দরকারী দড়িটা খুঁজে বার করল। তারপর সেটা পেঁচিয়ে নিয়ে চাকাটায় টান মারল।

...তিমুর তখন ঘুমে অচৈতন্য। রিতা তার ঘাড়ে থাবা দিয়ে নাড়া দিল। ধাক্কাটা সে টেরই পেল না। রিতা তখন কম্বলটা এক কামড়ে টেনে মেঝেয় ফেলে দিল।

তিমুর উঠে বসল।

হতভম্বের মতো তিমুর জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে রে? কিছু গোলমাল হয়েছে না কি?'

কুকুরটি তার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে লেজ নাড়তে আর মাথা দোলাতে লাগল। ঠিক তখুনি তিমুরের কানে এল ছোট পেতলের ঘণ্টাটা ঠুন্‌ঠুন্‌ করে বাজছে।

এত রাতে তাকে কার দরকার পড়ল ভেবে না পেয়ে সে বারান্দায় এসে রিসিভারটা তুলে ধরল।

'হ্যাঁ, ফোনে তিমুর কথা বলছি। কে? তুমি?.. জেনিয়া, তুমি নাকি?'

প্রথমে তিমুর ধীরস্থির হয়ে শুনছিল। ক্রমে তার ঠোঁট কাঁপতে আরম্ভ করল। তার মুখটা লাল হয়ে উঠল। নিশ্বাস পড়তে লাগল জোরে জোরে।

অস্থির হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'মাত্র তিন ঘণ্টার জন্যে? জেনিয়া! তুমি কাঁদছ নাকি? আমি কিন্তু শুনতে পাচ্ছি... কাঁদবে না — বুঝেছ? আমি এখুনি আসছি...'

রিসিভারটা টাঙিয়ে রেখে সে শেলফ্‌ থেকে টাইম টেবিলটা নামাল।

'হ্যাঁ, ঠিকই তো; রাত ১১টা ৫৫ মিনিটেই তো শেষ গাড়ি। তার পরেরটা ছাড়ে ৩টা ৪০এ।' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগল সে। 'বেজায় দেরি হয়ে গেছে! কিন্তু কিছুই কি করা যায় না? নাঃ! বেজায় দেরি হয়ে গেছে!'

কিন্তু জেনিয়াদের বাড়ির গেটে একটা লাল তারা রাতদিন জ্বলে। সেটা সে জ্বেলেছে নিজের হাতে। তার সোজা তীক্ষ্ন ছটা জ্বলজ্বল আর দপদপ করছে তার চোখের সামনে।

একজন কম্যান্ডারের মেয়ে বিপদে পড়েছে! হঠাৎ ঘেরাও হয়ে পড়েছে কম্যান্ডারের অভাগা মেয়েটি।

হন্তদন্ত হয়ে পোশাক পরেই সে ছুটে বেরিয়ে পড়ল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে পৌঁছল সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাড়ির দাওয়ার সামনে। ডাক্তারবাবুর ঘরে তখনও আলো জ্বলছিল। তিমুর দরজায় টোকা দিল। বিস্মিত ডাক্তারবাবু দরজাটা খুলে দিলেন।

শুষ্ক স্বরে অবাক হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাকে চাই?'

তিমুর উত্তর দিল, 'আপনার কাছেই এসেছি।'

'আমার কাছে?' সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক একমুহূর্ত কি যেন ভাবলেন তারপর দরজাটা হাট করে খুলে দিয়ে বললেন, 'তাহলে ভেতরে এস!..'

বেশিক্ষণ তাদের কথা হল না।

'আমরা এতদিন এই করেছি।' দীপ্ত চোখে তিমুর তার বিবরণ শেষ করল। 'আমরা এই সবই করেছি। এই আমাদের খেলা। এইজন্যেই আপনার কলিয়াকে এখন আমার দরকার।'

একটিও কথা না বলে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। আচমকা তিমুরের থুৎনি ধরে তার মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কলিয়ার শোবার ঘরে গিয়ে ঘাড় ধরে তাকে ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন।

বললেন, 'উঠে পড়। তোকে ডাকছে।'

ভয়ে চোখ বড় বড় করে কলিয়া বিড়বিড় করে বলল, 'আমি কিছু জানি না। সত্যি, দাদু, আমি কিছু জানি না।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আবার শুষ্ক স্বরে বললেন, 'ওঠ্, তোর বন্ধু তোকে ডাকতে এসেছে।'

...দুহাতে হাঁটু জড়িয়ে ধরে টঙের মধ্যে একটা খড়ের

গাদার ওপর বসে জেনিয়া তিমুরের অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তিমুরের বদলে জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকল কি না, কলিয়া কলোকলচিকভের উষ্কখুষ্ক মাথাটা।

জেনিয়া অবাক হয়ে বলল, 'তুমি? কি চাও তুমি?'

কলিয়া নীচু গলায় ভয়ে ভয়ে বলল, 'ঠিক জানি না। আমি ঘুমোচ্ছিলাম। ও এল। ঘুম ভেঙে উঠলাম। আমায় ও পাঠাল। বলেছে তুমি আমি নেমে এসে গেটের কাছে গিয়ে যেন দাঁড়াই।'

'কেন?'

'জানি না! নিজেরই আমার মাথা কেমন ভোঁভোঁ করছে। নিজেই আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না, জেনিয়া।'

অনুমতি নেবার মতো কেউ ছিল না। কাকা গিয়েছিল মস্কোতে। তিমুর লণ্ঠন জেবলে একটা কুড়ুল যোগাড় করে আনল। তারপর কুকুরটাকে ডেকে বাগানে চলে গেল। গ্যারেজঘরের দরজাটার কাছে এসে সে দাঁড়াল। কুড়ুল থেকে তার দৃষ্টি সরে এল তালাটার ওপর। হ্যাঁ! সে জানে কাজটা উচিত হচ্ছে না। কিন্তু এছাড়া আর তো কোনো উপায়ও নেই। সজোরে একটা ঘা মারতেই তালার মুখটা ছুটে গেল। গ্যারেজঘরের মধ্যে থেকে সে বের করে নিয়ে এল মোটর সাইকেলটা।

হাঁটু গেড়ে বসে কুকুরটির মুখে চুমু খেয়ে সে দুঃখ করে বলল, 'রাগ করিস না রিতা। এছাড়া কোনো উপায় ছিল না আমার।'

জেনিয়া আর কলিয়া গেটে অপেক্ষা করছিল। দূর থেকে দ্রুত এগিয়ে আসছিল একটা আলো। আলোটা সোজা এসে পড়ল তাদের ওপর। শোনা গেল ইঞ্জিনের গুরু গুরু আওয়াজ। ধাঁধানো আলোয় চোখ কুঁচকিয়ে তারা পিছিয়ে গেল বেড়ার দিকে। হঠাৎ আলোটা নিভে গেল। থেমে গেল ইঞ্জিনের শব্দ। তাদের সামনে এগিয়ে এল তিমুর। কোন কিছু ভণিতা না করেই তিমুর আরম্ভ করল, 'কলিয়া, তুই এখানে থাকবি, ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে পাহারা দে। সারা দলের কাছে তোকে তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। জেনিয়া উঠে বসো! আমরা চল্লাম — মস্কোয়!'

জেনিয়া আনন্দে চীৎকার করে তিমুরকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল।

'উঠে পড়ো জেনিয়া, উঠে বসো!' গম্ভীর হবার চেষ্টা করে তিমুর হেঁকে উঠল, 'জোরে ধরে থাক! ছাড়ছি কিন্তু — চললাম!'

থরথর করে গর্জন করে উঠল মোটর, কলিয়ার হতভম্ব চোখের সামনে দেখতে দেখতে পেছনের লাল আলোটা মিলিয়ে গেল। একটু দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে রাইফেলের মতো সেটাকে কাঁধে ধরে আলো ঝলমল বাড়িটার চারপাশে সে টহল দিতে লাগল।

গম্ভীর চালে কদম বাড়াতে বাড়াতে সে বিড়বিড় করতে লাগল, 'সৈনিকের জীবন সত্যিই বড় কঠোর! রাতদিন এক মুহূর্তের জন্যেও শান্তি নেই!'

...ভোর তিনটে প্রায় বাজে বাজে টেবিলের সামনে কর্নেল আলেক্সান্দ্রভ বসেছিলেন। টেবিলের ওপর একটা কেটলি। সেটা ততক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আর ছিল কিছুটা সসেজ, রুটি আর পনীর কাটা।

ওলগাকে তিনি বললেন, 'আমাকে আধ ঘণ্টার মধ্যেই যেতে হবে। দুঃখ রইল জেনিয়ার সঙ্গে দেখাটা আর হল না। কাঁদছ নাকি, ওলিয়া?'

'ও যে কেন এল না, জানি না। ওর জন্যে ভারি দুঃখ হচ্ছে আমার। ওর কত ইচ্ছে ছিল তোমাকে দেখবে, এখন তো এক্কেবারে ক্ষেপেই যাবে। এমনিতেই যা ক্ষেপা।'

বাবা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওলিয়া, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। খারাপ দলের সঙ্গে জেনিয়া মিশবে, ওকে কেউ খারাপ করবে, কিংবা ও কারুর হুকুম তামিল করে বেড়াবে — তা তো আমার বিশ্বাস হয় না। না! এ তার ধাতে নেই!'

অনুযোগের সুরে ওলগা বলল, 'ওই তো বিপদ! ওকে একবার এ কথা বললেই হল। এমনিতেই তো এক কথা শিখে রেখেছে — ও নাকি তোমার মতো হয়েছে। তা কিন্তু মোটেই নয়! ছাদে উঠে ও কি করেছিল জানো? চিমনির ভেতর দিয়ে একটা দড়ি ঝুলিয়ে দিয়েছিল। তারপর যেই আমি ইস্ত্রি করতে যাব অমনি সেই ইস্ত্রিটা তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। তুমি যখন যাও বাবা, তখন ওর চারটে জামা ছিল। দুটো তো এর মধ্যেই ছিঁড়ে কুটিকুটি হয়ে গেছে। তৃতীয়টা গায়ে ছোট হয়। যেটা রয়েছে সেটা আর ওকে পরতে দেব না। আমি নিজে ওকে তিনটে নতুন জামা করে দিয়েছি। এর মধ্যে ও সেগুলো নষ্ট করে ফেলেছে। সারাক্ষণ গায়ের এখানে ওখানে কাটা ছেঁড়া কালশিটে। আর কিছু বলতে গেলেই সে ঠোঁট ফুলিয়ে চোখদুটো ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকবে। সবাই অবিশ্যি মনে করে, মেয়ে তো নয়, ফুলটি। কিন্তু একবার গিয়ে দ্যাখ না, ফুলই বটে! ছুঁলেই ছ্যাঁকা খাবে। বাবা, মোটেই ভেবো না যে ওর স্বভাব তোমার মতো হয়েছে! একবার যদি ওকে সে কথা বলেছ তাহলে ও একনাগাড়ে তিনদিন ধরে চিমনিতে চড়ে ধেই ধেই করে নাচতে থাকবে।'

বাবা তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন। মেনেও নিলেন তার কথা, 'আচ্ছা, আচ্ছা। ওকে বুঝিয়ে বলব। চিঠিও লিখব ওকে। তবে খুব বেশি শাসন কোরো না ওলিয়া। ওকে বলো, আমি ওকে খুব ভালবাসি, বলো, ওর কথা আমি সব সময় ভাবি। বলো, আমরা শীগ্‌গিরই ফিরে আসব, আর আমার জন্যে যেন ও কান্নাকাটি না করে — কেননা ও যে কম্যাণ্ডারের মেয়ে।'

বাবার গা ঘেঁষে এসে ওলগা বলল, 'সে তবু কাঁদবেই। আমিও তো কম্যান্ডারের মেয়ে। আমিও কাঁদব।'

ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে আয়নার কাছে গেলেন বাবা। বেল্ট বেঁধে ফিল্ড-শার্টের ভাঁজগুলো টান করে নিলেন।

হঠাৎ বাইরের দরজাটা খুলে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। দরজায় ঝোলান পর্দাগুলো সরিয়ে জেনিয়া এসে ঢুকল ভেতরে! কাঁধদুটো এমনভাবে কোনাচে করে ঢুকল যে মনে হল সে লাফিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

কিন্তু কোন চিৎকার কি লাফালাফি না করে সে নিঃশব্দে দ্রুত এগিয়ে এসে বাবার বুকে মুখ লুকোল।

তার কপালময় ধুলো, এলোমেলো জামাকাপড়ও দাগে ভর্তি।

উদ্বিগ্ন হয়ে ওলগা জিজ্ঞাসা করল, 'কোত্থেকে এলি রে জেনিয়া? এখানে এলিই বা কেমন করে?'

মাথা না ফিরিয়ে জেনিয়া হাত নাড়িয়ে ইশারা করে যেন জানাতে চাইল, 'একটু থাম। বিরক্ত করো না আমাকে। আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কোর না!..'

জেনিয়ার বাবাও ওকে তুলে নিয়ে সোফায় বসলেন, কোলে টেনে নিলেন ওকে। মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি নিজের হাতের চেটো দিয়ে কাদা-মাখা কপালটা ওর মুছে দিলেন।

'চমৎকার, জেনিয়া, লক্ষ্মী মেয়ে!'

'কিন্তু তোর সারা গায়ে ধুলো কাদা ভর্তি — মুখচোখ যে কালো হয়ে গেছে! এখানে এসে পেঁছিলি কেমন করে?' আবার জিজ্ঞাসা করল ওলগা।

জেনিয়া দ্বারদেশে ঝোলান পর্দাগুলোর দিকে দেখাল। ওলগা দেখল তিমুর সেখানে দাঁড়িয়ে।

সে তার চামড়ার দস্তানা খুলছিল। কপালে মোটরের হলদে রঙের তেলের দাগ। মুখটা ঘর্মাক্ত, ক্লান্ত, ভালভাবে নিজের কাজ সারার পরে মজুরদের মুখের ভাব যেমন হয় তেমনি। মাথা নুইয়ে সে অভিবাদন জানাল সবাইকে।

'বাবা!' বলে চেঁচিয়ে উঠে জেনিয়া একলাফে তার কোল থেকে নেমে দৌড়ে গেল তিমুরের কাছে। 'কারো কথা বিশ্বাস করো না, বাবা, কেউ কিছু জানে না। এ এল তিমুর — আমার খুব ভাল বন্ধু।'

বাবা উঠে এসে এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে তিমুরের করমর্দন করলেন। জেনিয়ার মুখে হাসির ঝলক দেখা দিল, যেন খুব একটা জয় হয়েছে তার। সন্ত্রস্ত

আড়চোখে সে ওলগাকে একবার দেখে নিল। এখনো ওলগা কিছুই বুঝতে পারছে না, তিমুরের কাছে এগিয়ে এল সে, 'তাহলে... নমস্কার...'

একটু পরেই ঘড়িতে তিনটে বাজল।

জেনিয়া ব্যস্ত হয়ে বলল, 'বাবা, তুমি কি এক্ষুনি যাবে? আমাদের ঘড়ি তো ফাস্ট।'

'না, জেনিয়া ঘড়ি ঠিক আছে।'

'তোমার ঘড়িও যে ফাস্ট, বাবা।' বলেই সে এক দৌড়ে টেলিফোনের চাকতি ঘুরিয়ে সময় জানতে চাইল।

যান্ত্রিক কণ্ঠে উত্তর এল, 'এখন তিনটে বেজে চার মিনিট!'

জেনিয়া দেয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'এটা ফাস্ট — তবে মাত্তর এক মিনিট। বাবা, আমাদের স্টেশনে নিয়ে চল বাবা, তোমাকে তুলে দিয়ে আসব!'

'না, জেনিয়া, তা হয় না। আমাকে অনেক কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে।'

'কেন? টিকিট তো আগেই কেটে রেখেছ, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা রেখেছি।'

'গদি আঁটা সিট?'

'হ্যাঁ, গদি আঁটা।'

'ইস, তোমার সঙ্গে গদি আঁটা গাড়িতে করে দূরে বহুদূরে চলে যেতে পারলে কী মজাই না হত!..'

নিয়মিত স্টেশন এটা নয়। মস্কোর সরতিরোভচ্নায়াতে মালপত্র রাখার চত্বরের মতো ছোট একটা প্ল্যাটফর্ম মাত্র। সেখানে রেলের লাইন আছে, সুইচ, রেলগাড়ি, গাড়ি সবই আছে — কেবল লোক দেখা যায় না। প্ল্যাটফর্মে একটি সাঁজোয়া গাড়ি এসে দাঁড়াল। একটা লোহার জানালা খুলে গেল। ভেতরের আগুনের শিখায় মুহূর্তের জন্য দেখা গেল ইঞ্জিন ড্রাইভারের মুখটা। জেনিয়ার বাবা, কর্নেল আলেক্সান্দ্রভ চামড়ার কোট পরে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

একজন লেফটেনান্ট তাঁর কাছে এগিয়ে এসে অভিবাদন করে বলল, 'কমরেড কর্নেল, আমরা রওনা হতে পারি কি?'

'হ্যাঁ।' কর্নেল ঘড়ি দেখলেন — তিনটে বেজে তিপ্পান্ন। 'নির্দেশ ছিল তিনটা তিপ্পান্নয় ছাড়বার।'

কর্নেল আলেক্সান্দ্রভ নিজের গাড়ির কাছে গিয়ে চারিদিকে তাকালেন। ধীরে ধীরে আলো দেখা দিচ্ছিল তবুও আকাশটা ছিল মেঘলা। ভিজে হাতলটা ঘোরাতেই ভারি দরজাটা খুলে গেল। পাদানিতে পা রাখতে গিয়ে তিনি হেসে মনে মনে আওড়ালেন:

'গদি আঁটা সিট?'

'হ্যাঁ গদি আঁটা...'

তিনি ঢুকতেই ঘড়ঘড় করে ভারি ইস্পাতের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। মসৃণ ছন্দে, কোনও রকম ঝাঁকুনি না দিয়ে বা শব্দ না করে সেই সাঁজোয়া দৈত্য ধীরে ধীরে গতি বাড়াতে শুরু করল। ধীরে ধীরে বেড়িয়ে গেল ইঞ্জিনটা, তার পেছনেই চলেছে কামানের গাড়িগুলো। মস্কো পড়ে রইল পেছনে। আকাশের তারাগুলো মিলিয়ে গেল কুয়াশায়। সকাল হচ্ছে।

সকালে শহর থেকে বাড়িতে ফিরে তিমুর কি মোটর সাইকেল কিছুই না দেখতে পেয়ে গেওর্গি ঠিক করল তিমুরকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবে। সে চিঠি লিখতে বসেছে এমন সময় জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল লাল ফৌজের একজন সৈনিক খোয়ার পথ দিয়ে এগিয়ে আসছে।

একটা খাম বার করে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কমরেড গারায়েভ?'

'হ্যাঁ।'

'গেওর্গি আলেক্সেয়েভিচ?'

'হ্যাঁ।'

'দয়া করে খামটা সই করে নিন।'

লাল ফৌজের সৈনিক চলে গেল।

গেওর্গি খামখানা ভাল করে দেখে অর্থপূর্ণভাবে শিস দিতে লাগল। এই তো! এতদিন ধরে সে যার পথ চেয়ে ছিল — এই তো তা এসে গেছে। সে খাম খুলে ভেতরের খবরটা পড়ে যে চিঠিটা লিখতে আরম্ভ করেছিল সেটা মুঠো করে দলা পাকাল। তিমুরকে আর পাঠিয়ে দিতে হবে না বরঞ্চ ছেলেটার মাকেই টেলিগ্রাম করে দিতে হবে যেন বাগান-বাড়িতে এসে সে থাকে।

ঠিক তক্ষুনি তিমুর ঘরে এসে ঢুকল। রাগে আগুন হয়ে গেওর্গি

টেবিলের উপর ঘুষি মারল। কিন্তু তিমুরের পেছনে দেখা গেল ওলগা আর জেনিয়াকে।

'আস্তে!' ওলগা বলল, 'চেঁচাতেও হবে না, টেবিল চাপড়াতেও হবে না। তিমুরের কোন দোষ নেই। দোষ আপনার আর আমারই।'

'ঠিক কথা।' বলল জেনিয়া। 'বকবেন না ওকে। ওলিয়া টেবিলটা ছুঁয়ো না কিন্তু, ওদের ওই রিভলভারটার আওয়াজ হয় সাংঘাতিক।'

গেওর্গি জেনিয়ার দিকে তাকাল। তারপর রিভলভারটার দিকে, তারপর বোঁটা ভাঙা চীনামাটির ছাইদানির দিকে। এতক্ষণে তার মাথায় ঢুকল ব্যাপারটা।

বলল, 'সে রাতে তাহলে তুমি জেনিয়াই এখানে শুয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, আমি। ওলিয়া ওঁকে ব্যাপারটা সব খুলে বলো। ততক্ষণ তিমুর আর আমি কিছু কেরোসিন আর ন্যাকড়া নিয়ে মোটর সাইকেলটা পরিষ্কার করি।'

...পরের দিন ওলগা অলিন্দে বসেছিল। এমন সময় গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল এক কম্যান্ডার। এমন আত্মবিশ্বাসের ভঙ্গিতে এল, যেন সে নিজের বাড়িতে আসছে। অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াতেই ওলগা দেখল ট্যাঙ্ক-বাহিনীর ক্যাপ্টেনের উর্দি পরে তার সামনে যে এসে দাঁড়িয়েছে সে গেওর্গি।

'এ আবার কি?' ওলগা মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করল। 'অপেরার কোন নতুন পার্ট নাকি?'

গেওর্গি উত্তর দিল, 'না। এক মিনিটের বিদায় নিতে এলাম। এ কোন নতুন পার্ট নয় — তবে নতুন উর্দি বটে।'

ওলগা গেওর্গির উর্দিতে ট্যাঙ্ক-বাহিনীর ব্যাজটা দেখিয়ে একটু লাল হয়ে বলল, 'এ জন্যেই কি সেদিন আপনি বলেছিলেন, লোহা আর কংক্রীট ভেদ করে আমরা সোজা মারি বুকে?'

'হ্যাঁ, এইজন্যেই। ওলিয়া, একটা গান শোনান, এমন একটা গান শোনান যা আমার দূর পথের যাত্রায় আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব।'

সে বসল। ওলগা এ্যাকর্ডিয়নটা তুলে নিল:

বিমানচালক বৈমানিক!
শূন্যগামী হে সৈনিক!

আকাশে পাখা বিস্তারি
সাগর ভূধর দাও পাড়ি।
আবার ফিরে আসবে কবে?
হয় যদিবা হোক না দেরি,
তবু তোমায় আসতে হবে, হোক না দেখা নিমেষেরই!
মাটিতে কি, আকাশে কি,
পরের দেশের নভস্থলে
লাল তারকা আঁকা দুটি
ভীষণ মধুর ডানা মেলে
যেথায় থাকো
মনে রেখো,
যেমন ছিল সেই সে মেয়ে
আছে আজো পথ চেয়ে।

'নিন, শুনলেন তো!' ওলগা বলল, 'কিন্তু এ গান যে কেবল বিমানচালকদের নিয়ে। ট্যাংকচালকদের সম্বন্ধে তেমন ভাল কিছুই জানি না।'

'তাতে কিছু যায় আসে না।' গেওর্গি বলল, 'গান ছাড়া দেখুন না আমার জন্যে ভাল কোন কথা খুঁজে পান কিনা।'

মনের মতো কোন ভাল কথা চিন্তা করতে করতে ওলগা হঠাৎ গভীর দৃষ্টিতে গেওর্গির ধূসর চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল। তাতে আর হাসির লেশমাত্র ছিল না।

জেনিয়া, তিমুর আর তানিয়া ছিল বাগানে।

জেনিয়া বলল, 'শোন। গেওর্গি তো যাচ্ছেন। এস, আমরা দলবল মিলে তাঁকে বিদায় দিই। চল, এক নম্বর সাধারণ জমায়েতের সংকেতটা জানিয়ে দেওয়া যাক। খুব হৈচৈ হয় তাহলে — তাই না?'

তিমুর বলল, 'দরকার নেই।'

'কেন?'

'দরকার নেই! আর কাউকে তো এইভাবে বিদায় দেওয়া হয় নি।'

'বেশ, দরকার না থাকে নেই।' রাজি হয়ে গেল জেনিয়া। 'তোমরা ততক্ষণ এখানে বসো — আমি একটু জল খেয়ে আসি।'

সে চলে যেতে তানিয়া হাসিতে ফেটে পড়ল।

কিছু বুঝতে না পেরে তিমুর জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?'

তানিয়া আরো জোরে হেসে উঠল, 'সাবাস মেয়ে! কেমন চালাক আমাদের জেনিয়া! বলে কিনা জল খেয়েই আসছি!'

শোনা গেল টঙের ওপর থেকে জেনিয়া গর্বভরে চেঁচাচ্ছে, 'হুঁশিয়ার! এবার এক নম্বর সাধারণ জমায়েতের সঙ্কেত দিচ্ছি।'

'মেয়েটা কি ক্ষেপেছে!' তিমুর তড়াক করে উঠল। 'একশো'টা ছেলে যে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসবে! কি করছ তুমি?'

কিন্তু সেই ভারি চাকাটা ইতিমধ্যেই ক্যাঁচক্যাঁচ করে ঘুরছে। দড়িতেও ঝাঁকি পড়ছে, টান লাগছে: তিনবার পরপর বেজে একবার করে থামা! সঙ্গে সঙ্গে চালগুলোর ছাদে, চিলেকোঠায়, মোরগের খোপে, ঝনঝন করে বেজে উঠল সঙ্কেতের ঘণ্টা, টিনের ক্যানেস্তারা, ঝুমঝুমি। একশো'জন না হলেও জন পঞ্চাশেক ছেলে সেই পরিচিত সঙ্কেত শুনে পড়ি কি মরি করে বাগানে ছুটে এল।

জেনিয়া চোখের নিমেষে বারান্দায় এসে ডাকল, 'ওলিয়া! আমরা গেওর্গিকে বিদায় দেব! বেশ বড় একটা দল জড় হয়েছি আমরা। দেখো না একবার জানালা দিয়ে।'

পর্দা সরিয়ে গেওর্গি আশ্চর্য হয়ে বলল, 'ওহো! বেশ বড় দল হয়েছে দেখছি! এত বড় যে ট্রেনে চাপিয়ে যুদ্ধে পাঠালেই হয়।'

'আমাদের যে সে উপায় নেই।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেনিয়া। পুনরুক্তি করল তিমুরের কথার, '...সমস্ত সেনানায়কদের কড়া হুকুম দেওয়া আছে বাচ্চাদের দেখলেই লাথি মেরে ভাগিয়ে দিতে। কি দুঃখের কথা! তাহলে আমিও কোথায়ও ভিড়ে চলে যেতাম ওখানে... লড়াইয়ে, আক্রমণে। মেশিনগান দল, দাঁড়াও!.. এক নম্বর!'

'হুঃ এক নম্বর! বাক্যবাগীশ আর কাকে বলে!' ওলিয়া ক্ষেপাল। এ্যাকর্ডিয়নের ফিতেটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে সে বলল, 'বেশ, ওঁকে যদি বিদায় দিতেই হয় এসো গান বাজনা করেই বিদায় দিই।'

সার বেঁধে তারা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। ওলগা এ্যাকর্ডিয়ন বাজাতে লাগল। বোতল, টিনের ক্যানেস্তারা, কাঁচের বোয়েম আর লাঠিসোঁটার ঐক্যতান মিলে রীতিমত জমাট সঙ্গত চলল তার সঙ্গে।

সবুজ পথ ধরে তারা চলতে লাগল। যত এগোচ্ছে ততই দল বাড়ছে তাদের। বাইরের লোকে প্রথম প্রথম কেউ বুঝতে পারে নি এত হৈচৈ চিৎকার হচ্ছে কেন।

কি নিয়ে কেন এই গান। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝে সবাই হাসতে হাসতে কেউ মনে মনে, কেউ সরবেই শুভেচ্ছা জানাল গেওর্গিকে।

প্ল্যাটফর্মের কাছে পেঁছতেই সেনাবাহিনীর একটা গাড়ি স্টেশনে না থেমেই পেরিয়ে গেল।

প্রথম দিককার গাড়িগুলো লাল ফৌজের সৈনিকে ভর্তি। সবাই হাত নেড়ে চিৎকার করে তাদের অভিনন্দন জানাল। তারপরে এল চ্যাপটা ধরনের গাড়িতে করে এক দঙ্গল সবুজ স্যাফ্‌ট লাগানো সেনাদলের গাড়ি। তারপর এল খোপ খোপ ঘরে ঘোড়ার পাল। মাথা দোলাচ্ছে বিচালি খাচ্ছে ঘোড়াগুলো। তাদের দেখেও ছেলেরা হুররে বলে অভিনন্দন জানাল। সকলের শেষে এল একটা খোলা গাড়িতে করে আগাগোড়া ছাই রঙের ত্রিপলি ঢাকা বিরাট কোণাকৃতি একটা জিনিস। ওটার পাশে দাঁড়িয়ে ট্রেনের ঝাঁকুনিতে দুলতে দুলতে চলেছে একজন সান্ত্রী।

সৈনিকদের গাড়ি চোখের আড়াল হয়ে গেলে এল একটি যাত্রীবাহী ট্রেন। কাকাকে বিদায় জানাল তিমুর।

গেওর্গির কাছে এগিয়ে গেল ওলগা।

বলল, 'তাহলে, বিদায়! কতদিনের জন্যে? বহুদিনের জন্যে কি?'

মাথা নেড়ে গেওর্গি তার হাতে চাপ দিল, 'তা জানি না — কপালে যা আছে।'

বাঁশি বাজল। ঐক্যতানও ফেটে পড়ল কর্ণভেদী আওয়াজে। ট্রেন চলে গেল।

চিন্তায় ডুবে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওলগা। জেনিয়ার চোখে যেন গভীর আনন্দের একটা আভা। কেন তা সে নিজেই জানে না।

তিমুরও ব্যাকুল হয়েছিল, তবে সে তার মনের ভাব চেপে রাখল।

'বাস্‌! এখন আমিই দেখছি বাড়িতে একা পড়লাম।' গলার স্বরটা যেন তার বদলে গেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সিধে হয়ে সে যোগ করে দিলে, 'তবে মামণি তো কাল এখানে আসছেন।'

জেনিয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'আর আমি কি কিছুই নই? আর ওরা?' সে তার সাথীদের দেখিয়ে দিল। 'আর এই লাল তারাটা?' তিমুরের বুকের লাল তারকাটা দেখাল।

মনের ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলে ওলগা তিমুরকে বলল, 'কিছু ভেব না! তুমি যেমন সব সময় অপরের কথা ভাবতে, এখন তেমনি তার শোধ দেবে তারাও।

মাথা তুলল তিমুর।

হ্যাঁ, এরপর, এরপর আর কোনো উত্তরই এই সাধাসিধে সুন্দর ছেলেটির পক্ষে সাজে না!

সাথীদের সকলের উপর চোখ বুলিয়ে একটু হেসে সে বলল, 'দেখছি... সকলেই বেশ আছে। সবাই নিশ্চিন্ত! তার মানে আমারও ভাবনা নেই তাহলে!'

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
'রাদুগা' প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

Аркадий Гайдар

ТИМУР И ЕГО КОМАНДА

На языке бенгали

Gaidar A.

TIMUR AND HIS SQUAD

In Bengali